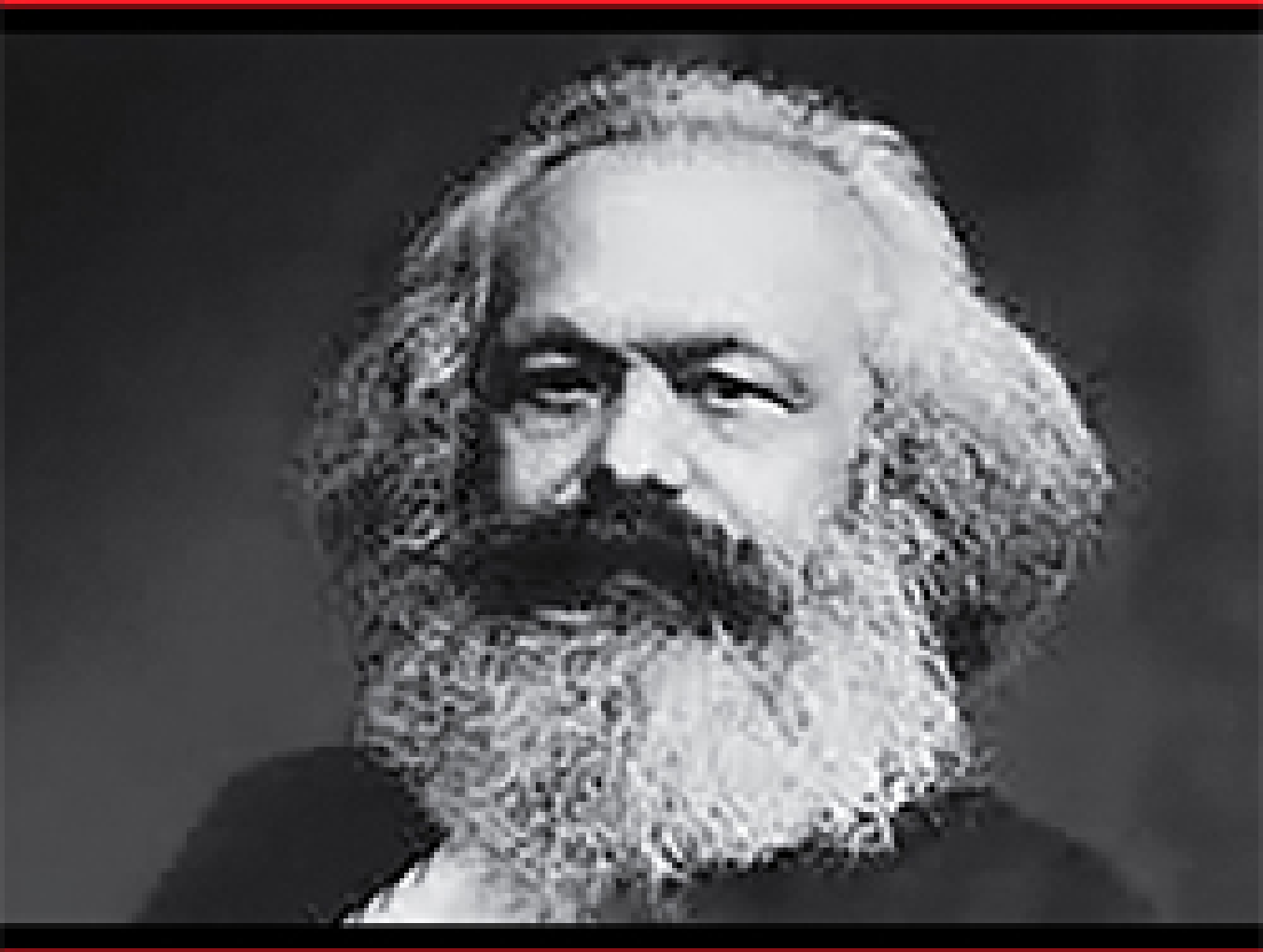
মার্কসবাদের ত্রিধারায়

পুঁজি

কার্ল মার্কস



সার-সংক্ষেপ : রেবতী বর্মন

দ্য ক্যাপিটাল

কার্ল মার্কস

সার-সংক্ষেপ : রেবতী বর্মন

ভূমিকা ও সম্পাদনা : জাকির হোসেন

নালন্দা

প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা, ৬৯ প্যারীদাস রোড বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।
স্বত	প্রকাশক
প্রচ্ছদ	ধ্রুব এষ
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০০৯
মুদ্রণ	অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	লিন্তা ডিজাইন ভিউ ৬৯ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।
মূল্য	১৫০.০০ টাকা মাত্র

©	Publisher
The Capital	By Karl Marks
First Published	February 2009
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 69 Paridash Road Banglabazar Dhaka-1100
Phone	01552 456919
Price	150.00 Only
ISBN	984 70093 0035 6
E-mail	nalondaa@yahoo.com

ভূমিকা

'বিজ্ঞানে প্রশস্ত রাজপথ বলে কিছু নেই, একমাত্র সেই ব্যক্তিই তার উজ্জ্বল শীখরে পৌঁছাতে পারে, যে ক্লান্তির ভয়ে ভীত না হয়ে তার পাথুরে পায়ে-চলা-পথে কষ্ট করে চলেন'—ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ডের ফরাসী সংস্করণের ভূমিকায় উদ্বৃত বাক্যটি মার্কসেরই, প্রকাশক মরিস লাশাত্র-কে লেখা চিঠির অংশ। এই অভিজ্ঞতাটাই মার্কসের হয়েছিল—ক্যাপিটাল লিখতে গিয়ে। আর তাই, এই দেড়শ বছর পরেও অর্থনৈতিক চর্চ্চার ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার ক্ষেত্রে, সমাজতাত্বিক চর্চ্চার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক চর্চ্চার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব বহন করছে মার্কসের 'ক্যাপিটাল'। সম্প্রতি এক জরিপে বলা হয়েছে, বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বইয়ের তালিকায় 'ক্যাপিটাল' অন্যতম। এই ক্রেতাদের একটা বড় অংশই তরুণ, যারা ভালোভাবে জানতে চাচ্ছে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থাটাকে।

কি আছে মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-এ, যার জন্যে দেড়শ বছর ধরে এতো আগ্রহ-আলোচনা-সমালোচনা বইটা নিয়ে অথবা ফ্রেডারিক এঙ্গেলসই বা কেন বলেছিলেন—'পুঁজিপতি এবং শ্রমিকরা যতোদিন ধরে পৃথিবীতে আছে, ততোদিনের মধ্যে এমন কোন বই বেরোয়নি, শ্রমিকদের কাছে যার গুরুত্ব আলোচ্য বইটার সমান'? ক্যাপিটাল-এ মার্কস মূলত বিশ্লেষণ করেছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে এবং উদ্ঘাটন করেছেন তার এমন কিছু গূঢ় বিষয়, যা নিয়ে বহুকাল যাবত বিভ্রান্তি তৈরি করে আসছিলেন পুঁজিবাদী অর্থনীতিকরা। মার্কসের ৩ খণ্ডে লেখা ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ডে বিশ্লেষণ করেছেন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া। এই খণ্ডেই আলোচিত হয়েছে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'উদ্ঘাটন–উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। দ্বিতীয় খণ্ডে পুঁজির আবর্তন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন, আর তৃতীয় খণ্ডে পুঁজি চলাচলের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত রূপসমূহের অনুসন্ধান। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। যদিও তা লেখা শেষ হয়েছিল বেশ আগে, কিন্তু বারবার বিশ্লেষণ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরো অনুসন্ধান, প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন—এসব ক্ষেত্রে মার্কস প্রচুর সময় নিয়ে প্রত্যেকেটা বিষয় আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করতেন। মার্কসের নিজের কথায়—যতোক্ষণ না গোটা ব্যাপারটা সামগ্রিকভাবে আমার সামনে উপস্থিত হচ্ছে, ততোক্ষণ কোনো কিছু পাঠানোর সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারছি না। অর্থনীতির জটিল বিষয়সমূহ আলোচনার জন্যে মার্কসকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল বিজ্ঞান-গণিতসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের। ফলে আলোচনা যে সবার জন্যে সহজবোধ্য হয়নি, তা অনুমান করা যায়। মার্কস নিজেই লিখেছেন—ক্যাপিটালে যে পদ্ধতি নিয়োগ করা হয়েছে, তা যে খুবই কম

বোধগম্য হয়েছে, তা বোঝা যায় সে বিষয়ে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ধারণা থেকে। এটি প্রথম খণ্ড প্রকাশের কিছুদিন পরের কথা।

বাংলা ভাষার পাঠকদেরকে ক্যাপিটালের সাথে একটা প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেস্টা করেছিলেন রেবতী বর্মন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তৈরি করেছেন এই সহজ সারসংক্ষেপ, যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন রেবতী বর্মন, মার্কসবাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২০-এর উপরে। ক্যাপিটাল-এর এই সংক্ষিপ্তসারটি পাঠকদের জন্যে সাধারণ ধারণা অর্জনে সহায়ক হবে, কিন্তু তা মূল 'ক্যাপিটাল'-এর বিকল্প নয় কখনোই। রেবতী বর্মন লিখেছিলেন সাধুভাষায়, বর্তমান সময়ের পাঠকদের সুবিধার জন্যে আমরা তা কথ্য ভাষায় পরিবর্তন করেছি, বাকি সবই অপরিবর্তিত রয়েছে। বইটি পাঠকদের মূল 'ক্যাপিটাল' পড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি অথবা তা ক্যাপিটাল-এর মূল বিষয়বস্তুটা পাঠকদের জানাতে পারবে।

জাকির হোসেন
বাগেরহাট

সূ চি প ত্র

মার্কসের বিচার-রীতি ৭
ক্যাপিটাল পণ্য ১১
বিনিময়, মুদ্রা ও পণ্য সঞ্চালন ২১
মুদ্রার পুঁজিতে পরিবর্তন ২৬
উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন ৩৪
সমবায় ৪৮
শ্রমবিভাগ ও মেনুফেকচার ৫১
মেশিন ও আধুনিক শিল্পোৎপাদন ৫৫
মজুরি ৬৫
পুঁজির সঞ্চয় ৬৮
মুনাফার হার ও সংকট ৭৫
প্রাথমিক সঞ্চয় ৮৭

মার্কসের বিচার-রীতি

হাট বাজারে আমরা দেখতে পাই, একটা পণ্যের সঙ্গে অন্য একটা পণ্যের বিনিময় ঘটেছে; অথবা একটা বিশেষ পরিমাণ মুদ্রায় একটা বিশেষ পরিমাণ পণ্য বিক্রি হচ্ছে। একে বলে পণ্যের মূল্য রূপ। প্রতিদিনের এই প্রত্যক্ষগোচর ঘটনার পিছনের রহস্য উদ্‌ঘাটন মার্কসের আগে আর সম্ভব হয়নি। এরিস্টটল এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলেন; এডাম স্মিথ এবং রিকার্ডো অনেকটা অগ্রসর হয়েও সফল হননি। এরিস্টটলের পরবর্তী দুই হাজার বছরে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণা সম্ভব হয়েছে; কিন্তু পণ্যের মূল্য-রূপটার প্রতিদিনের একটি ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার মার্কসের আগে আর হতে পারেনি। এর কারণ কি? মানুষের গোটা দেহটা সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ যত সোজা, এর মূলভিত্তি জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা তত সোজা নয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা অপেক্ষা অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বিচার করাটা আরো কঠিন। এর জন্য যেমন নেই কোন বিজ্ঞানাগার, তেমনি পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের জন্যেও কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া নেই। সামাজিক বিষয়ে যে চিন্তা প্রণালী অবলম্বন করতে হবে, তাকে বলা হয় বিয়োজনরীতি (abstraction)। মানুষের শ্রমজাত দ্রব্যের পণ্যরূপ অথবা পণ্যের মূল্য রূপই হ'ল বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক জীবকোষ। এই জীবকোষটি থেকেই আমরা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামোর পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছতে পারি।

মার্কসের বিচারের বিষয় হল পুঁজিতন্ত্রী সমাজের উৎপাদন-প্রথা এবং বিনিময় ব্যবস্থা। মার্কসের সময়ে আদর্শ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ ছিল ইংল্যাণ্ডে। এই কারণেই মার্কস তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ গড়ে তুলতে ইংল্যাণ্ডকেই সাক্ষ্য ও নিদর্শনরূপে ধরেছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রভাবে বিশেষ একটি সমাজ শ্রেণী সংঘর্ষের দিকে কতোটা অগ্রসর হয়েছে তা আমরা বিশদভাবে দেখতে চাই না। দেখতে হবে, এই বিশিষ্ট উৎপাদন প্রথার পিছনে যে মূলীভূত সত্য এবং সূত্র রয়েছে, তা কি করে অবশ্যম্ভাবীরূপে এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে গড়া এবং ভাঙ্গার কাজ করে চলেছে। যে আধুনিক শিল্পের দিক থেকে বেশি অগ্রসর তার প্রভাব অনগ্রসর অথবা অল্প-অগ্রসর দেশগুলোর উপর পড়বেই। প্রথমোক্ত দেশগুলোতে যা আজ সম্ভব হয়েছে, অনুন্নত দেশগুলোতেও তা অবশ্যই হতে হবে।

যে সমস্ত দেশে সবেমাত্র শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছে সেগুলোর উপর পীড়ন হয় দুই দিক থেকে। নবোত্থিত পুঁজিতন্ত্রের অত্যাচার তো থাকবেই, তাছাড়া গতায়ু সামন্ততন্ত্রও অবশ্যই মরণ কামড় দেবে। ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে কারখানা-শিল্প উৎকর্ষ লাভ করেছে, তাই সেখানে ফ্যাক্টরী আইনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং অবশেষে তা প্রবর্তিতও হয়েছে। কিন্তু মার্কসের সময়ে অনুন্নত জার্মানীতে তা সম্ভবপর হয়নি। পুঁজিতন্ত্রের অপরিণত বিকাশের দরুণ অনুন্নত দেশের উপর চূড়ান্ত

অত্যাচার হতে থাকে; তাছাড়া সামন্তযুগের মুমূর্ষ উৎপাদন-বিধির নির্যাতনও তাকে সহ্য করে যেতে হয়। এই অবস্থাটাকেই মার্কস বলেছেন, "We suffer not only from the living, but also from the dead. সকল অনুন্নত দেশই শুধু বর্তমানের চাপেই নির্লিপ্ত হয়না, অতীতের দুঃসহ ভারও তাকে সহ্য করে যেতে হয়।

আঠার শতকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকেই ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণ সূচিত হয়। উনবিংশ শতকে আবার আমেরিকারই গৃহযুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির ইঙ্গিত দেয়। মার্কসের সময়ে ইংল্যাণ্ডে সামাজিক ভাঙ্গন খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অচিরেই এর প্রতিক্রিয়া গোটা ইউরোপে অনুভূত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর কতখানি বিকাশ হল তার উপরই এই প্রতিক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করবে। কোনো উচ্চ এবং মহৎভাবের অনুপ্রেরণা থেকে নয়, আপন শ্রেণী-স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের পক্ষে যে সব অন্তরায় রয়েছে আইনের সাহায্যে তা দূর করা শাসকশ্রেণীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস তাই তাঁর মূলগ্রন্থ 'ক্যাপিটালে' ইংল্যান্ডের ফ্যাক্টরী আইন এবং এর চলাচল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। কেননা, একটা জাতি অপর একটা জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মার্কস কখনো কোনো ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবে দেখেন নি। ব্যক্তিকে তিনি পুঁজিপতি ভূস্বামী প্রভৃতিরূপেই দেখেছেন। মার্কসের কাছে ব্যক্তি বিশিষ্ট শ্রেণী-সম্বন্ধ এবং শ্রেণী স্বার্থেরই প্রতীক। বিশেষ একটি সামাজিক সম্বন্ধের উদ্ভব এবং বিকাশের জন্য তিনি কখনো ব্যক্তিকে দায়ী করেন নি। ব্যক্তি হয়তো বা অন্তরে উচ্চভাব পোষণ করতে পারে, কিন্তু অন্তরালে শ্রেণীস্বার্থের প্রভাবই তার উপর কাজ করতে থাকে। ব্যক্তি প্রধানতঃ তার আপন শ্রেণীরই প্রতিনিধি।

অর্থনীতির বিচারে, স্বাধীন চিন্তার শত্রু ব্যক্তিগত বিত্ত এবং শ্রেণীস্বার্থ। ইংল্যাণ্ডে চার্চ তার উনচল্লিশ দফা ধর্মানুশাসনের আটত্রিশ দফার উপর আক্রমণ নীরবে সহ্য করবে, কিন্তু তার উনচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মুনাফার উপর হস্তক্ষেপ করলে তা সে কখনোই সহ্য করবে না। ধর্মযাজক শ্রেণীর কাছে নাস্তিকতা ক্ষমার্হ্য; কিন্তু ব্যক্তিগত বিত্তের উপর আক্রমণ অমার্জনীয়। তা সত্ত্বেও সংরক্ষণপন্থীদের কেউ কেউ চিন্তার দিক থেকে যে অগ্রসর না হয়েছেন, এমন নয়। শাসক শ্রেণীও ভাবতে শিখেছে সমাজ একটা জড়ীভূত নিশ্চল পদার্থ নয়। সমাজ পরিবর্তন-সাপেক্ষ এবং প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন ঘটছে।

১৮৩০ পর্যন্ত জার্মানীতে বুর্জোয়া সমাজ গড়ে ওঠেনি। সুতরাং অর্থনীতি অথবা পলিটিক্যাল ইকনমির ক্ষেত্রও সেখানে তখন পর্যন্ত প্রস্তুত হতে পারেনি। এই বিজ্ঞানটি তখন ধার করে আনতে হত ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের নিকট থেকে। জার্মানীর অধ্যাপকমণ্ডলীকে তখন 'স্কুলের ছাত্র' ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেয়া চলত না। বিদেশের শিক্ষাই তারা নিজের দেশের অ-সম অবস্থায় খাটাতে চাইত।

১৮৪৮ থেকেই জার্মানীতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথার শুরু। এখন অর্থনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো বটে, কিন্তু অধ্যাপকদের পক্ষে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার আর সম্ভব হলো না। যদি কেউ বলেন যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সর্বশেষ উৎপাদন ব্যবস্থা, এটির পরিবর্তন নেই, তখন কি তাকে বৈজ্ঞানিক বিচার বলা যেতে পারে?

শ্রেণী সংঘর্ষ যতদিন আত্মপ্রকাশ না করে, ততদিন পর্যন্ত নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার সম্ভব হলেও হতে পারে। পুঁজিতন্ত্রের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে বলেই পুঁজিবাদী লেখকেরা মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তাদের মতে, পুঁজিতন্ত্রই বিকাশের চরম অবস্থা এবং অপরিবর্তনীয় একটি সমাজ-ব্যবস্থা।

ইংল্যাণ্ডের কথাই ধরা যাক। শ্রেণী সংঘর্ষ যতদিন তীব্র রূপ নেয়নি, ততদিন 'পলিটিক্যাল ইকনমির' বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রক্ষা করা হয়েছে। রিকার্ডো শ্রেণী স্বার্থের সংঘাত এবং 'মজুরি ও মুনাফা'র বিরোধীতাকে তাঁর বিচারের মূলসত্য বলে ধরে নিয়েছেন। এই বিরোধ যে প্রাকৃতিক নিয়মের মতই একটা সমাজবিধি তা স্বীকার করতে তাঁর মোটেই বাধেনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এর সমাপ্তিও ঘটল। রিকার্ডোর জীবনকালেই সিসমণ্ডি রিকার্ডোর আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলোকে আক্রমণ করেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩০-এই দশ বছর ইংল্যাণ্ডে একই সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচার এবং বৈজ্ঞানিক বিচারের অপপ্রয়োগ দুই-ই শুরু হয়েছে। এই বিষয়টার পশ্চাতে রয়েছে ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন সামাজিক ব্যবস্থা। একদিকে আধুনিক কারখানা শিল্প তার শৈশব অতিক্রম করে ১৮২৫-এ সর্ব প্রথম অর্থসংকটের সম্মুখীন হয়েছে, অপরদিকে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া নেতৃত্বে, শ্রমিকের দল যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছে। এমন বিরোধিতায় বুর্জোয়া জগতের শ্রেণী-সংঘর্ষ কিছুকালের জন্য ঢাকা পড়ল। 'শস্য আইন' এর পর থেকে অভিজাত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ খুব তীব্র হয়ে ওঠে, ১৮৩০ সাল থেকেই ইংল্যাণ্ডে প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সৃষ্টি হলো।

ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক অধিকার হস্তগত করল। মত এবং পথ দু'দিক থেকেই শ্রেণীযুদ্ধ স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট রূপ ধারন করে। সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক দিকটাও খসে যায়। ইংল্যান্ডে ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট প্রবর্তনের সময় এর বিরুদ্ধে যুক্তি দর্শানোর জন্য ম্যাঞ্চেস্টারে কর-অলারা সিনিয়রকে নিয়োগ করে। সিনিয়র আবিষ্কৃত 'Last hour' সিদ্ধান্ত[১] একটা উদ্ভট বস্তু। বিজ্ঞানের জায়গা দখল করে বসল বিবেকহীনতা। অবশ্য সে সময় করডেন এবং ব্রাইট 'শস্য আইন বিরোধী লীগের' পক্ষ থেকে যে সব পুস্তিকা প্রণয়ন এবং প্রচার করেন সেগুলোর তেমন কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও ঐতিহাসিক একটা দিক যে রয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

'১৮৪৮-৪৯'-এর ইউরোপময় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া সহজেই ইংল্যাণ্ডের উপরও পড়ল। শ্রমিকের দাবী উপেক্ষা করা একরকম প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শাসকশ্রেণীর একদল অর্থনীতিকে পুঁজিবাদীদের পুঁজিবাদীদের চাটুকারিতা হতে উদ্ধার

---

১. ফ্যাক্টরী আক্টের প্রবর্তন দ্বারা শ্রমিকের প্রতিদিনের শ্রম সময় দশ ঘণ্টা করার কথা ওঠে। সিনিয়র মালিকশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করে যুক্তি দেখালেন, শ্রমিককে দিয়ে মালিক এগার ঘণ্টায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের এবং শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য উঠিয়ে নেয়, বাকী এক ঘণ্টায় শ্রমিক মালিকের জন্য মুনাফা সৃষ্টি করে, সুতরাং মালিক তার নিজের জন্য শ্রমিককে খাটায় মাত্র এক ঘণ্টা, এটাই সিনিয়রের সুপ্রসিদ্ধ 'Last hour theory'।

করে ভদ্র পোশাক পরাতে চেষ্টা করলেন। এই দলেরই প্রতিনিধি জন স্টুয়ার্ড মিল। যে সব বস্তুর মিশ খাওয়া প্রকৃতি বিরুদ্ধ, সেগুলোকে মিশ খাওয়ানোই তাঁর চেষ্টা। 'Irreconcilables' গুলোকে 'reconcile' করার ব্যর্থ চেষ্টায় তিনি প্রবৃত্ত হন। সবদিক রক্ষার জন্য এই চেষ্টা বুর্জোয়া অর্থনীতির দারিদ্র্য এবং দৌর্বল্যই প্রকাশ করে। ফ্রান্সে এবং ইংল্যাণ্ডে যে সময় পুঁজিতন্ত্রের গতিবেগ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, জার্মানীতে তখন পুঁজিতন্ত্র মাত্র দানা বেঁধেছে। তবুও জার্মানীর শ্রমিকরা সেখানকার বুর্জোয়াদের চেয়ে অনেক বেশি শ্রেণী সচেতন হয়ে দাঁড়াল। এই কারণেই, বুর্জোয়া অর্থনীতির যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, তখনই আবার এর পথে অন্তরায়ও দেখা দিয়েছে। এরূপ অবস্থায় অধ্যাপক মণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কেউবা বেশটিয়েটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কদর্য করতে প্রবৃত্ত হলেন, আবার কেউবা জন স্টুয়ার্ট মিলের পন্থা অবলম্বন করে পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলোকে সমন্বয় করতে মনোনিবেশ করলেন। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির দরুণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োগ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যথার্থ পথ অনুসরণ করে চললেন।

মার্কসের মূলগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' রুশ ভাষায় অনূদিত হয় ১৮৭২ সালে। রুশিয়ার প্রফেসর সাইবার ক্যাপিটাল পড়ে লেখেন—মার্কসতত্ত্ব এডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর মতবাদের বিকাশ ও পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৮৭২ সালের সেন্ট পিটার্সবুর্গের 'ইউরোপিয়ান মেসেঞ্জার' মার্কসের বিচাররীতি সম্পর্কে যে বিশদ আলোচনা করেন, মার্কস স্বয়ং তার উল্লেখ করেছেন। পুঁজিতন্ত্রের তথ্যসমূহ এবং বিষয়গুলো বিশ্লেষণ ও সমন্বয় দ্বারা মার্কস যেমন এর মূলসূত্রগুলো আবিষ্কার করেছেন, তেমনি এই সূত্রের বিকাশ এবং পরিণতির ক্রমটিও দেখিয়েছেন। সামাজিক জীবনের উপর এগুলোর ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। কি করে সমাজের এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখানোই মার্কসের চেষ্টা। আজকার সমাজের অস্তিত্ব যেমন সত্য, তেমন তার গুণাত্মক অবস্থান্তরও অনিবার্য। এই অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষের প্রত্যয় আছে কিনা, ব্যক্তি এই সম্পর্কে কতখানি সচেতন, এরূপ বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না। সামাজিক পরিবর্তন ব্যক্তির ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও চেতনার অপেক্ষা রাখে না; বরং সমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তন দ্বারাই ব্যক্তির অভিপ্রায় এবং চেতনার রূপ নির্ধারিত হয়। সমাজের তুলনায় ব্যক্তির ইচ্ছা এবং চেতনা এত ক্ষুদ্র বলেই তাদের কখনো সমাজ পরিবর্তনের এবং সামাজিক অবস্থান্তরের মূলসূত্র ধরা যায় না। মার্কসের গবেষণায় তত্ত্ব তথ্যে সাথে তুলিত হয়েছে। পরস্পরের তুলনায় তথ্যগুলো সমাজ-প্রগতির বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন স্তরের বিষয়। সমাজ প্রগতির বিভিন্ন স্তরগুলো যে বিভিন্ন সমাজসূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে মার্কস তা দেখিয়েছেন। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, অর্থনৈতিক সূত্র সব দেশের সব যুগের ও সব সময়ের জন্য এক—মার্কসের বস্তুতান্ত্রিক বিচার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছে। প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক যুগের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সূত্র আছে। সমাজের একটি বিশেষ প্রকারের বিকাশের আর যখন প্রয়োজন থাকে না, তখন সমাজ নতুন নিয়মের অধীন হয়। মার্কস তাঁর গবেষণায়

এই বিচার রীতি অবলম্বন করে একটি বিশেষ প্রকারের সমাজ স্তরের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিনষ্টি সম্পর্কে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমন এর পরবর্তী রূপটির সূত্রও আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই কারণেই মার্কসীয় বিচার রীতি বৈজ্ঞানিক বাস্তবের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন।

মার্কসের 'ডায়ালেক্‌টিক' হেগেলের 'ডায়ালেক্‌টিক' থেকে ভিন্ন। উপরোক্ত বিচার ডায়ালেকটিক সম্মত বিচার। সমাজকে পরিবর্তন সাপেক্ষ ধরে নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সূত্রগুলো আবিষ্কার এবং সেগুলোর পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণ, সম্পূর্ণভাবে ডায়ালেক্‌টিক বিচার-রীতিরই কাজ। মানুষের মনন ক্রিয়া হতে উদ্ভুত ধারণাই হেগেলের কাছে 'আইডিয়া' নামে একটা বস্তু অনপেক্ষ সত্ত্বা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেগেলের মতে এই 'আইডিয়া'ই বস্তুর স্রষ্টা, বাস্তব বিশ্বটা 'আইডিয়া'রই বাহ্য প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে বাইরের একটি বস্তু মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হলেই তাকে বলা হয় 'আইডিয়া'[২]। ১৮৪২ সালে মার্কস সর্ব প্রথম হেগেলের অতিন্দ্রীয় ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। সে সময় জার্মানীর চিন্তা জগতে হেগেলের খুব প্রভাব। কিন্তু মার্কস যখন ক্যাপিটাল প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন হেগেলকে 'dead dog' আখ্যা দেওয়া একটা ফ্যাসনে পরিণত হল। মার্কস তা দেখে প্রকাশ্যভাবেই নিজেকে হেগেলের শিষ্যরূপে ঘোষণা করলেন। 'ডায়ালেক্‌টিক' হেগেলের কাছে অতীন্দ্রিয় রূপ পেলেও তিনিই সর্ব প্রথম এটিকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার দেন। হেগেলের কাছে 'ডায়ালেক্‌টিক' মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে; মার্কস একে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরিয়ে আনলেন। হেগেলের ডায়ালেক্‌টিকের মূলে 'আইডিয়া'; মার্কসের কাছে তা বস্তু। ডায়ালেক্‌টিকের অতীন্দ্রিয় রূপটি জার্মানীতে আদৃত ছিল, কেননা তা চলতি সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী নয়। কিন্তু ডায়ালেক্‌টিকের বস্তুতান্ত্রিক রূপটি বরদাস্ত হলো না। সকল প্রকার সামাজিক ব্যবস্থাই যে সাময়িক এই সত্যটার উপরই মার্কসের ব্যাখ্যায় জোর পড়েছে। মার্কসের ডায়ালেকটিক নির্ভীক এবং বৈপ্লবিক। তা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছে এবং এটির ধ্বংস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে।

ক্যাপিটাল

পণ্য

এখন যেমন সমাজের ব্যবস্থা, চিরকাল তা ছিল না। আদিম যুগের মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল অনেক বেশি। এ লড়াই জীবন ধারণের লড়াই, জীবিকা নির্বাহের লড়াই। মানুষের হাতে তখন জীবন ধারণের উপায় ও উপকরণ ছিল খুবই সামান্য। পশুরা খাদ্য সংগ্রহ করে তার স্বাভাবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা দ্বারা। কিন্তু

২. মানুষ বাইরের একটি বস্তুকে যখনই প্রত্যক্ষ করে তখন বস্তুটি সম্পর্কে তার একটা ধারণা জন্মে। একেই মার্কস বলেছেন– Object transfered into the head.

মানুষকে যদি তার স্বাভাবিক হাতিয়ার হাত দুটির চালনা দ্বারাই খাদ্য সংগ্রহ করতে হত, তাহলে এতো মনুষ্য সমাজ ও সভ্যতা কখনো গড়ে উঠত না। মানুষের জীবন পশুস্তরের পর্যায়েই থাকত। খাদ্য আহরণ ও উৎপাদনের জন্য এই স্বাভাবিক হাতিয়ারই যথেষ্ট ছিল না। প্রকৃতিদত্ত অঙ্গকে সম্পূর্ণ করতে হল, হাতে গড়া উৎপাদনের যন্ত্র দ্বারা। অতি প্রথম যুগের এই হাতিয়ার পাথরের তৈরি। পাথর নির্মিত হাতিয়ার দিয়েই তখনকার জীবনোপায় সংগৃহীত হতে লাগল। কিন্তু তা দিয়ে শুধু শিকারই মিলতে পারে, উন্নত প্রণালীর উৎপাদন সম্ভব হতে পারে না। শিকারের জন্যে বনে জঙ্গলে লড়তে হলে দলবদ্ধভাবে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। এভাবে সামান্য যা সংগৃহীত হতো সকলে মিলে তা ভাগ-বাটোয়ারা করে খেত। এই বিশিষ্ট উৎপাদন প্রণালীর জন্যেই খাদ্য তখন ছিল সবার সাধারণ সম্পত্তি। কাজে কাজেই সমাজ কাঠামোও তখন এই বিশিষ্ট ব্যবস্থার অনুরূপ হয়ে গড়ে উঠল।

উৎপাদন রীতি ও সমাজের গড়ন এমনিভাবেই চিরকাল চলল না; রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। সমাজ প্রগতির ইতিহাসকে কি দৃষ্টিতে বিচার করা হয়? পেলিওলিথিক যুগ, নিওলিথিক যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ-ইত্যাদিতে বিভক্ত করে সমাজ প্রগতিকে দেখা হয়। প্রথমটির অর্থ হলো প্রস্তর যুগ। বৈজ্ঞানিক রীতিতে ইতিহাস বিচার করতে হলে, উৎপাদনের উপকরণগুলোর বিভিন্নতা দিয়ে এর স্তর নির্ণয় করাই প্রকৃষ্ট উপায়। মার্কস এই বিচার পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হয়ে সমাজ-ইতিহাসের শেষের স্তরটির অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের বিশদ আলোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে যে সূত্র অনুসারে সমাজ বিচিত্র রূপান্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, তাও তিনি দেখিয়েছেন। উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তনের জন্যই যে সমাজ কাঠামোর রূপান্তর হয়, তাই মার্কসের প্রতিপাদন।

ধীরে ধীরে মানুষ লোহা আবিষ্কার করল, পাথরের জায়গা নিল লোহা। উন্নততর উৎপাদন প্রণালীর জন্য জীবনযাত্রাও অনেকখানি স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল। কৃষিকাজ এবং হস্তশিল্পের প্রবর্তন হলো। এই স্বচ্ছন্দতার ফলে সংঘবদ্ধ সমবায়ি জীবনও শিথিল হয়ে পড়লো; সাধারণ স্বত্ত্বের জায়গায় দেখা দিল ব্যক্তিগত বিত্ত, বহুর উপর প্রতিষ্ঠিত হলো কতিপয়ের প্রভূত্ব। তখন থেকে আত্মপ্রকাশ করল শ্রেণী বিভাগ, সমাজে বড় ও ছোটর দুইটি শ্রেণী।

সমবায়ি জীবনে সকলের উৎপাদিত দ্রব্যই সকলের ভেতর বণ্টন হতো। একজনের প্রস্তুত দ্রব্য অন্যের প্রস্তুত দ্রব্যের সাথে বিনিময় করে প্রয়োজন মিটানো হতো না। প্রথমদিকে অভাবও ছিল কম। নিজের পরিবারের গণ্ডির ভিতরেই মোটামুটি অনেক জিনিস প্রস্তুত করার সুবিধা ছিল। ধীরে ধীরে একজনার উৎপাদনের অতিরিক্ত অংশ, অপরজনের উৎপাদনের অতিরিক্ত অংশের সাথে বিনিময় হতে লাগল। এই বিনিময় প্রথা ক্রমেই বিকশিত হয়ে সকল উৎপাদনকারীকেই সকল উৎপাদনকারীর উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। এখন দেখা যায় সবাই উৎপাদন করে বিনিময়ের জন্যে। সুতরাং সম্পত্তির উপর সমবায় অধিকার অপসারিত হয়ে যখনই ব্যক্তিগত বিত্তের সৃষ্টি হলো, তখন থেকে শুরু হয়েছে বিনিময়-প্রথা, লেনদেন

ব্যবস্থা। কেননা, একজন কখনও তার সব রকমের অভাব মেটানোর জন্য নানা প্রকারের উৎপাদন করতে পারে না। প্রত্যেককেই নির্ভর করতে হয় প্রত্যেকের উৎপাদনের উপর। অন্যের উৎপন্ন দ্রব্য আমার হাতে আসতে পারে আমার দ্রব্যের বিনিময়ে। বিনিময় প্রথার প্রচলনের সময় এর পরিসর ছিল খুবই সংকীর্ণ; ধীরে ধীরে এখন বিনিময়ের গণ্ডি সুপ্রশস্ত হয়ে পড়েছে।

'মার্কস' আলোচনা করেছেন বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন বিধি ও এর মূলসূত্র। বিবর্তন ক্রমের ভেতর মানুষই সেরা সৃষ্টি। নিজের দেহ সম্পর্কে সবিশেষ জানলে জীব-জগতের পূর্বতন জাতিগুলো সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মে। পূর্ববর্তী জাতির পরিবর্তনের ফলেই যে নব-জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি। সমাজ জীবনেও আমরা দেখতে পাই পূর্বতন সমাজ কাঠামোগুলোর বিকশিত রূপ বুর্জোয়া সমাজ। এর সম্পর্কে ভাল রকম ধারণা হলে পূর্বতন সমাজ-কাঠামোগুলোর গড়ন আমরা ভাল রকমে জানতে পারব। মার্কস বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কেই পর্যালোচনা করেছেন, প্রসংগত পূর্ব সমাজ কাঠামোগুলোরও পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

কোন একটি বিষয়ের আলোচনার পদ্ধতি বা রীতি কি? গোটা সমাজ সম্পর্কে যদি বিচার করতে হয়, তা হলে আমরা মোট জনসংখ্যা থেকে শুরু করতে পারি। এই মোট জনসংখ্যাকে জাতি, দেশ, শ্রেণী প্রভৃতিতে ভাগ করে দেখতে পারি। শুধু তা নয়, এদের ভেতরে ব্যবসা-সম্বন্ধ, বিনিময় প্রথা, মুদ্রার প্রচলন প্রভৃতি ছোট ছোট ধারণাগুলোতে এসে আমরা পৌঁছাই। এভাবে আমাদের কাছে পৃথক পৃথক সামাজিক বিষয়গুলোর ও অনুষ্ঠানগুলোর ধারণা থেকে ক্রমেই পৃথক পৃথক ছোট ছোট ধারণাগুলোতে এসে পড়েছি—পণ্য, মূল্য, বিনিময় প্রভৃতির ধারণায় উপস্থিত হয়েছি। এখন কথা উঠতে পারে, এই রীতিতে বিচার কি খুব বৈজ্ঞানিক। বৃহত্তম বিষয়টি, অর্থাৎ সমাজ সম্পর্কেই আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। সুতরাং, যার সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই, তা থেকে যে বিচার পদ্ধতি শুরু হয় তাতে কখনোই ভাল ফল দেখা দিতে পারে না। কিন্তু একটা সুফল অবশ্য আমরা পাই। এরূপ বিচারে সমগ্র সমাজ কাঠামোর ভিতরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ও ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন যদি ফিরে এই ছোট ছোট ধারণাগুলো থেকে আমরা ক্রমেই বড়র দিকে যাই, অর্থাৎ যেখান থেকে বিচার শুরু হয়েছিল সেখানেই আবার ফিরে আসি, তবে সমগ্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ হবে।

মার্কস তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ক্রিটিক'-এ এই বিচার রীতি সম্পর্কে বলেছেন। ক্যাপিটাল গ্রন্থে এই বিচারভঙ্গি তিনি বিশদভাবে প্রয়োগ করেছেন। মার্কস-এর পূর্ব শতকে 'সমগ্র'র অঙ্গীভূত পৃথক পৃথক বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, তখনকার অর্থনীতিকরা সমগ্র থেকে শুরু করে ছোটর ধারণায় পৌঁছাতেন।

মার্কস এই ছোট ছোট ধারণাগুলো হতে যাত্রা করে বৃহত্তর বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পরিস্ফুট করেছেন। পণ্য এবং পণ্যের বিশ্লেষণ হতে শুরু করে বিনিময়, মূল্য,

উদ্বৃত্ত মূল্য প্রভৃতির সাহায্যেই ধাপের পর ধাপ উঠে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্যাপিটালের প্রথম ছত্রটিই হলো, "যে সকল সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা বিশেষ রকমে প্রচলিত, সেখানে তাদের ধন-দৌলত পণ্যের রাশীকৃত স্তূপ হিসাবেই প্রকটিত হয়। এই রাশীকৃত পণ্যসম্ভারের একক হলো যে কোন একটা পণ্য।" সুতরাং আমাদের গবেষণা শুরু হতে হবে পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়েই। "প্রধানত পণ্য একটা দ্রব্য, এমন দ্রব্য যার গুণ হতে মানুষের এক ভাবের অভাব মিটতে পারে। এই অভাব মনের দিক থেকেও হতে পারে, শরীরের চাহিদা হিসাবেও দেখা দিতে পারে। প্রত্যক্ষত, আমাদের উপভোগের উপায় হিসাবেই হোক আর পরোক্ষভাবে আমাদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি হিসাবেই হোক, কি ভাবে সে দ্রব্য আমাদের চাহিদা মিটায় তা দেখার প্রয়োজন নেই।"

"লোহা, কাগজ ইত্যাদি আবশ্যকীয় প্রত্যেকটি দ্রব্যকে, গুণগত ও পরিমাণগত দু'দিক থেকেই দেখা যেতে পারে। দ্রব্য বহুগুণের সমষ্টি, সুতরাং বহু রকম প্রয়োজনেই তা লাগতে পারে। দ্রব্যের বহুবিধ আবশ্যকতা আবিষ্কার করা ইতিহাসের কাজ এই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণের সমাজ-স্বীকৃত মান আবিষ্কারও ইতিহাসই করে। মানের বিভিন্নতার আংশিক কারণ দ্রব্যের বিভিন্ন রকমের প্রকৃতি এবং আংশিক কারণ মানুষের মনগড়া রীতি (convention)। লোহাকে মাপতে হয় ওজন দ্বারা, কাপড়কে মাপতে হয় দৈর্ঘ্য দ্বারা।"

দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা থেকে জন্ম নেয় দ্রব্যের ব্যবহার মূল্য। দ্রব্যের প্রকৃত গুণাগুণ থেকেই দ্রব্যের উপযোগিতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই উপযোগিতা দ্রব্যের বহির্জাত বিষয় নয়, তার ভিতরেই রয়েছে। লোহা হোক, শস্য হোক, মনি মুক্তা হোক সব পণ্যই বস্তু বলেই এক একটি ব্যবহার মূল্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্য। দ্রব্যের প্রয়োজনীয় গুণাগুণকে ভোগের উপযুক্ত করে পাবার জন্য যে শ্রম তার উপর আরোপ করা হয়, সেই শ্রমের সাথে দ্রব্যের এই সব প্রাকৃত গুণাগুণ নিঃসম্পর্ক। কাঠকে চেয়ার হিসাবে উপভোগের উপযুক্ত করে পেতে হলে মিস্ত্রীকে শ্রম করতে হয়। মিস্ত্রীর শ্রম কাঠে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু চেয়ারে কাঠের যে গুণাগুণ পূর্ব থেকেই আছে তা নৈসর্গিক, মানুষ সেগুলো সৃষ্টি করেনি। এই ব্যবহার মূল্যই বিনিময় মূল্যের ভিত্তি। পণ্যের ব্যবহার মূল্য না থাকলে বিনিময়ে কখনো তা দাঁড়াতে পারে না।

বিনিময় মূল্য কাকে বলে? দু'টি পণ্য ধরে নেয়া যাক, যেমন শস্য ও লোহা। যে অনুপাতে এগুলো একে অন্যের সাথে বিনিময় হতে পারে তা নিম্নোক্ত সমীকরণের রূপে দেখানো সম্ভব।

১ মণ শস্য = ১ পাউন্ড লোহা।

এই সমীকরণটি আমাদের কিসের নির্দেশ দেয়? সমীকরণের দুই পক্ষ অর্থাৎ শস্য ও লোহার ভিতরে একই পরিমাণের একটি সাধারণ বস্তু নিহিত রয়েছে। সুতরাং দুইটি দ্রব্যই একটি তৃতীয়ের সমান, এই তৃতীয়টি দু'টির কোন একটি নয়—লোহাও নয়, শস্যও নয়। পণ্যের বিনিময় মূল্য এই তৃতীয়টির দ্বারাই ধার্য হয়। ব্যবহার মূল্য হিসেবে পণ্যগুলো বিভিন্ন গুণসম্পন্ন, কিন্তু বিনিময় মূল্য হিসাবে তারা একই বস্তুর বিভিন্ন পরিমাণ মাত্র।

পণ্যগুলোর ব্যবহার মূল্যকে আমরা যদি এখনকার মতো বাদ দিয়ে আমাদের বিচারের বহির্ভূত করে রাখি, তবে পণ্যগুলো শ্রম প্রসূত এই সত্যটিই অবশিষ্ট থাকে। কি বিশেষ প্রকারের শ্রম হতে এগুলো উৎপন্ন হয়েছে তাও বাদ দিলাম, তা হলে পণ্যকে আর আমরা টেবিল, ঘর অথবা কোন প্রকারের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য হিসাবে দেখি না; কোনো বিশেষ প্রকারের দ্রব্য যেমন মিস্ত্রী অথবা মুচীর শ্রম দ্বারা উৎপাদিত, সেই হিসেবেও দেখি না। এই অপনয়ন প্রণালীর প্রয়োগ দ্বারা এই সত্যেই আমরা উপনীত হলাম যে, শ্রম সর্বসাধারণের শ্রম, মানুষের শ্রম। তা হলে দেখা গেল মূলত সব জিনিসই মনুষ্য শ্রম প্রসূত; এই সত্যটি আবিষ্কার করতে গিয়ে কি বিশেষ ধরনের শ্রম প্রয়োগ করা হয়েছে তার বিচার আমরা অস্বীকার করছি। এভাবে দেখতে গেলে, অর্থাৎ সকল পণ্যই শ্রমের অবয়ব সম্পন্ন রূপ এইভাবে বিচার করলে এদের আমরা বলি মূল্য। বিনিময় মূল্যই একমাত্র রূপ, যার ভিতর দিয়ে মূল্য প্রকাশিত হয়।

এই ব্যবহার মূল্যের অথবা একটা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য রয়েছে—এই জন্য যে মানুষের শ্রমের তা একটি অবয়ব। মূল্যের পরিমাপ হবে কিসে? দ্রব্যের ভিতরকার মূল্য উৎপাদনকারী বস্তুর সন্ধান আমরা পেয়েছি। এই বস্তুটি মানুষের শ্রম। দ্রব্যের ভিতরে যতখানি শ্রম দেওয়া হয়েছে ততখানিই এটার মূল্য। শ্রমের পরিমাণ নিরূপিত হয় শ্রমের সময় দ্বারা; শ্রমের সময় ঠিক হয় সপ্তাহ, ঘণ্টা, মিনিট ইত্যাদি দ্বারা।

এখন কথা উঠতে পারে, একটি পণ্য প্রস্তুত করতে যার যত বেশি সময় প্রয়োজন হয়, তার পণ্যের তত বেশি মূল্য। প্রত্যেকটি পণ্য সামাজিক শ্রমের এক একটি একক অবয়ব। বিশেষ একটা পণ্য হয়ত বা একাধিক উৎপাদনকারী তৈরি করে কিন্তু এই পণ্য প্রস্তুত করতে সকলেরই সমান সময় লাগে না। তাছাড়া, যে কোনো পণ্যের উৎপাদনে 'সমাজ নির্ধারিত' শ্রম-সময় ঠিক আছে। বিভিন্ন উৎপাদনকারীর বিভিন্ন পরিমাণের শ্রমের সময়ে ভিতরে এই 'সমাজ নির্ধারিত শ্রম সময়' একটি 'মধ্যক'। অধিক সংখ্যক উৎপাদনকারীর যে সময় প্রয়োজন হয় তা দিয়েই এই 'মধ্যকটি' প্রভাবিত হয় এবং এটাই পণ্যের মূল্য। ব্যক্তিগত উৎপাদনকারীর সময় দিয়ে মূল্য নিরূপিত হয় না। সমাজ নির্ধারিত শ্রম সময় যদি হয় বারো ঘণ্টা তা হলে পণ্য প্রস্তুত করতে কারো দশ ঘণ্টা সময় লাগলেও তার পণ্যের মূল্য হবে বারো ঘণ্টা। এই 'সমাজ নির্ধারিত শ্রম সময়' সব অবস্থায়ই একরকম ও অপরিবর্তনীয় থাকতে পারে না। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ও তাদের প্রয়োগে 'সমাজ নির্ধারিত শ্রম সময়' কমে যেতে পারে—তখন পণ্যের মূল্য আগের মতো না থেকে হ্রাস পাবে।

এই বিচার ও আলোচনা থেকে যে সূত্রটিতে এসে আমরা পৌঁছাই তা এরূপ। কোন একটি বিশিষ্ট দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হবে সেই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের 'সমাজ নির্ধারিত শ্রম সময়' দ্বারা, দ্রব্য উৎপাদনে ব্যক্তিগত শ্রমের পরিমাণ দিয়ে নয়। যতক্ষণ না শ্রম-সময়ের পরিবর্তন হয়, ততক্ষণ পণ্যের মূল্য পূর্বের মতোই থাকবে।

কিন্তু শ্রমের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রম সময় হ্রাস পায়। আগে যে পণ্য দশ ঘণ্টায় তৈরি হতো, তা এখন হয়ত বা আট ঘণ্টায় তৈরি হবে। উৎপাদন শক্তির এই হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ণীত হয় নানা কারণ দ্বারা। যেমন শ্রমিকের গড়-পড়তা দক্ষতা, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও প্রয়োগ, উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠন, যন্ত্রপাতির প্রসার ও এদের কার্যকারিতা। প্রাকৃতিক এবং ভৌগলিক পরিবেশও বিশেষ কারণ। নিদর্শন-স্বরূপ দেখানো যেতে পারে, অনুকূল ঋতুতে হয়ত বা একই পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয় ৮মণ শস্য তৈরির জন্য, অথচ প্রতিকূল ঋতুতে তা দিয়ে প্রস্তুত হবে মাত্র চার মণ। সাধারণভাবে তা হলে এটাই দাঁড়ায়-শ্রমের উৎপাদনশক্তি বেশি হলে, দ্রব্য প্রস্তুত করতে শ্রম সময় প্রয়োজন হয় কম, সুতরাং এর মূল্যও হয় কম। পক্ষান্তরে, উৎপাদন শক্তি হ্রাস পেলে, শ্রম-সময়ের প্রয়োজন হয় বেশি, সুতরাং দ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়।

একটি জিনিসের ব্যবহার মূল্য আছে কিন্তু তার মূল্য নাও থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে, বাতাস, অনাবাদী জমি, মাঠ ইত্যাদি। অন্যদিকে একটি জিনিস শ্রম-প্রসূত হলেও এবং এর ব্যবহার মূল্য থাকলেও তা পণ্য নাও হতে পারে। এইখানে আমরা পণ্যের সংজ্ঞা দেব। দ্রব্য মাত্রই পণ্য নয়। দ্রব্যকে প্রস্তুত করে বিনিময়ের জন্য না পাঠিয়ে যদি নিজেই তা ভোগ করি, তবে তাকে পণ্য বলা চলে না। দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয়, উৎপাদন কর্তার ভোগে না লেগে যখন তা বিনিময়ের মারফতে অপর ব্যক্তির প্রয়োজনে আসে। দ্রব্যের কেবলই ব্যবহার মূল্য থাকলে চলবে না, তার 'সামাজিক ব্যবহার মূল্য'ও থাকা চাই অর্থাৎ অপরের তার জন্য চাহিদা থাকা চাই। অবশ্য ব্যবহারে না লাগলে কোন জিনিসেরই মূল্য থাকে না। এমন জিনিসে যে শ্রম দেওয়া হয় তাকে বলা চলে নিষ্ফল শ্রম।

সব পণ্যেরই একটি সাধারণ মূল্য রূপ আছে। এখানেই আমাদের কাছে একটি সম্পাদ্য উপস্থিত হল। এর সমাধানের জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা মোটেই চেষ্টা করেন নি। এই সাধারণ মূল্য রূপটিই পণ্যের মুদ্রারূপ। এখনকার সমাজে আমরা দেখি, সব পণ্যই মুদ্রার সাথে সমীকৃত হচ্ছে; অর্থাৎ পণ্যের সাথে পণ্যের বিনিময়ের পরিবর্তে বিনিময় হচ্ছে পণ্য ও মুদ্রায়। প্রথম প্রকারের বিনিময়কে আমরা বলতে পারি 'দ্রব্য বিনিময়' আর দ্বিতীয়টিকে 'বিক্রয়'।

পণ্যের মুদ্রারূপ কি বিনিময়ের প্রথম থেকেই প্রচলিত ছিল? যদি তা না হয়, তবে পণ্যে পণ্যে মূল্য-সম্বন্ধ হতে কি করে ধীরে ধীরে পণ্য ও মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধ প্রবর্তিত হল, এই বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করে দেখতে হবে। তা করলেই মুদ্রা সম্পর্কিত রহস্যও আমরা উদঘাটন করতে পারব।

সবচেয়ে সরল মূল্য-সম্বন্ধ প্রকটিত হয়, একটি পণ্যের সাথে অপর একটি পণ্যের বিনিময়ে ও সমীকরণে। একে বলা হয়'প্রাথমিক মূল্য সম্বন্ধ'। নিম্নোক্ত সমীকরণটি দিয়ে একে প্রকাশ করা যেতে পারে।

২০ গজ কাপড় = ১ কোট

বৈজিক সংখ্যার সাহায্যে একে নিম্নোক্তরূপে বলা যেতে পারে—

ক পণ্য ব = খ পণ্য দ

'ব' এবং 'দ' পণ্যের নাম, 'ক' এব 'খ' পণ্যের পরিমাণ। এভাবে মূল্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা সমীকরণের দু'টি পক্ষ ধরে নিয়েছি। ডান পক্ষটিকে বলা হয় আপেক্ষিকরূপ এবং বাম পক্ষটিকে তুল্য রূপ। মূল্য প্রকাশ মূল্য সমীকরণে এরা বিভিন্ন ভূমিকা সম্পাদন করে। কাপড় নিজের মূল্য প্রকাশ করছে কোটের ভিতরে, আর কোট নিষ্ক্রিয় থেকে কাপড়ের সামনে দর্পণের কাজ করছে। প্রথমটি সক্রিয়, নিজের মূল্য প্রকাশের জন্য উদ্‌ব্যস্ত; দ্বিতীয়টি নিষ্ক্রিয়, অন্যের মূল্য নিজের ভিতরে প্রকাশ করাই তার কাজ। কোন পণ্যের মূল্য ঠিক সেই পণ্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে যাওয়া একেবারেই অর্থহীন। কখনো কেউ বলে না, ২০ গজ কাপড় = ২০ গজ কাপড়; একই জাতীয় দুটি জিনিসের সমানত্ব প্রমাণ নিতান্তই হাস্যকর। সুতরাং কাপড়ের মূল্য প্রকাশ করতে অন্য ধরনের একটা পণ্যের প্রয়োজন হবে। অপর একটা পণ্যের সাথে তুলনা করে কাপড়ের মূল্য প্রকাশ করতে হবে। যে কোন পণ্যের মূল্য প্রকাশ করতে অন্য পণ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

এই সমীকরণে কোটকে কাপড়ের তুল্য হিসাবে দেখেছি, সুতরাং মূল্যের প্রকাশ করতে গিয়ে কাপড় হয়েছে আপেক্ষক। আপেক্ষক বললেই তুল্যটির কথা আপনা থেকেই মনে পড়ে। বস্তুত, আমরা কোটকে কাপড়ের তুল্য করে দু'টির ভিতরে যে শ্রমের পরিমাণ রয়েছে তাকেই প্রকাশ করেছি। অবশ্য এটা সত্য যে বুনন ও সেলাই দুইটি ভিন্ন ধরনের কাজ; কিন্তু মূলত, দু'টিই মানুষের শ্রম, মানুষের দৈহিক অপচয়। রবিনসন ক্রুশো তার নিজেরই শ্রমের প্রয়োগ করে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করত। বিবিধ উৎপাদনের জন্য তার শ্রমের সময় নানাভাবে ভাগ করে নিত। বিভিন্ন প্রকার শ্রম প্রয়োগ করলেও সকল শ্রমই ছিল একজন ব্যক্তিরই শ্রম। ব্যক্তিগত শ্রম এই প্রসঙ্গে বিচার্য নয়; বিভিন্ন পণ্য যে সমাজের মোট শ্রমেরই বিভিন্ন রূপ তা-ই আমাদের দেখার বিষয়।

তুল্য সম্পর্কে তিনটি সূত্র এখানে আমরা সন্নিবিষ্ট করতে পারি।

১। তুল্য স্বয়ং একটি ব্যবহার মূল্য, তার মধ্য দিয়ে মূল্য প্রকাশিত হয়েছে।

২। তুল্য বাস্তব শ্রমের (concrete labour) ফল, কিন্তু তার ভিতরে প্রকাশিত হয়েছে অমূর্ত শ্রম (abstract labour)।

৩। তুল্য যথার্থত ব্যক্তির শ্রম, কিন্তু তার ভিতরে প্রকটিত হয়েছে সর্ব সাধারণের সামাজিক শ্রম। তুল্যের ভিতরে দু'টি বিপরীত সত্যের অবস্থিতি দেখা গেছে। ব্যবহার মূল্য ও মূল্যে বাস্তব ও অমূর্ত শ্রম, ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রম--এই বিরুদ্ধ সত্যগুলোই প্রকাশিত হয়েছে তুল্যের ভিতরে।

দু'টি পণ্যের সমীকরণ হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম পক্ষটি প্রকাশিত হচ্ছে ব্যবহার মূল্য হিসাবে।

দ্বিতীয় পক্ষটি দেখা দিয়েছে প্রথমটির বিনিময় মূল্য রূপে। সব পণ্যের ভিতরেই ব্যবহার মূল্য ও মূল্য দুইটি বিপরীত সত্য রয়েছে। পণ্যের অন্তর্নিহিত এই বিরোধ প্রকাশ পায় এই সমীকরণের মধ্যে। এমনভাবে দু'টি পণ্যকে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়েছে যে, যার মূল্য প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়েছে সেটি প্রত্যক্ষভাবে রয়ে

গেল ব্যবহার মূল্য, আর যার ভিতর দিয়ে মূল্যকে প্রকটিত করা হল, তা হয়ে দাঁড়াল সাক্ষাত বিনিময় মূল্য।

শ্রম-প্রসূত সব দ্রব্যই সমাজের সব অবস্থাতেই এক একটি ব্যবহার মূল্য; কিন্তু সমাজ প্রগতির মাত্র একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে এই রকম দ্রব্য পণ্যের রূপ নেয়। দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয়, যখনই শ্রমকে আমরা মূল্য হিসেবে দেখি। পণ্যের মূল্যরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য অধিকসংখ্যায় পণ্যে পরিণত হতে থাকে।

প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা প্রাথমিক মূল্য-রূপের অপূর্ণতা দেখতে পাই। এই রূপটি ভবিষ্যত বিকাশের অঙ্কুরমাত্র। এই মূল্যরূপে আমরা মাত্র একটা পণ্যের সাথে অপর একটা পণ্যের বিনিময়-সম্বন্ধ দেখেছি। সুতরাং এটা থেকে আমরা প্রথম পণ্যটার অন্য সব পণ্যের সাথে সম্বন্ধ বুঝতে পারি না। কোট এই প্রাথমিকরূপে শুধুমাত্র কাপড়েরই তুল্য হয়েছে, অন্য কোন পণ্যের নয়। ২০ গজ কাপড় = ১ কোট, এরূপ এক একটা সমীকরণ থেকে আমরা মাত্র একটা পণ্যের সাথে আর একটা পণ্যেরই বিনিময় সম্বন্ধ দেখতে পাই। এই প্রাথমিক অবস্থায়, কাপড় ছাড়া আর যতগুলো দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয়েছে তাদের সাথে কাপড় পৃথক সমীকরণের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছে।

যথা– ২০ গজ কাপড় = ১ কোট
২০ গজ কাপড় = ২ জোড়া জুতা
২০ গজ কাপড় = ১ মণ ধান ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন একটা রূপ আমাদের কাছে এখনো আসে নি যা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে সকল পণ্যের সাথে যে কোন পণ্যের সম্বন্ধ বুঝতে পারব। এই অপূর্ণতা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে অন্য একটি মূল্য রূপের সৃষ্টি হল, একে বলা হয় 'বিতত' মূল্য রূপ (Extended form of value)। এই রূপটি হলো– ২০ গজ কাপড় - ১ কোট, অথবা = ১০ পাউন্ড চা, অথবা = ৪০ পাউন্ড কফি। কাপড় পণ্যটির মূল্য অন্যান্য যাবতীয় পণ্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই এখন কাপড়ের কাছে দর্পণ বিশেষ। কারণ এদের ভিতর দিয়ে কাপড় আপন সারবস্তু, অর্থাৎ মূল্যকে দেখছে। নিজের আসল চেহারাটা দেখার সুযোগ পেয়েছে। সব পণ্যেরই মূলে যে মানুষের শ্রম রয়েছে তা এই রূপে খুব বেশি করে ফুটে উঠেছে। একটা বিশেষ পণ্যের মূল্য বহু পণ্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে—এটা থেকে কি এই নির্দেশই আমরা পাই না যে, এই সব পণ্যের মাঝে বিশেষ রকমের একটা সমতা রয়েছে, একটা সাধারণ বস্তু এদের মাঝে অবস্থান করছে, এই সাধারণ বস্তুটি প্রাথমিক মূল্য-রূপে রয়েছে কিনা সন্দেহ থাকলেও বিততরূপে এই সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। পণ্যগুলোর মূলে যদি মানুষের শ্রম না থাকে, একটা বিশেষ পণ্য এতোগুলো পণ্যের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে কি করে?

প্রথম রূপ হতে অর্থাৎ ২০ গজ কাপড় = ১ কোট, এই সমীকরণ থেকে মনে করা যেতে পারে, এ দুটির বিনিময় সম্বন্ধ 'আকস্মিকভাবে' ঘটেছে, এদের ভেতর

সাধারণ কোনো বস্তুর অবস্থিতি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় রূপটিতে এই সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আকস্মিক রকমের কোন সম্বন্ধ এখানে টিকতে পারে না। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, কাপড়ের পরিমাণ সব সময়ই ২০ গজ রয়েছে, যে পণ্যই তুল্যরূপে ব্যবহার করা হোক না কেন, এই ২০ গজ পরিমাণের পরিবর্তন হয়নি। এতে কি মনে হয় না যে, আপেক্ষক ও তুল্যগুলোর ভিতরে বিশেষ পরিমাণের একটি সাধারণ বস্তু আছে? কিন্তু দ্বিতীয় স্তুপেরও অপূর্ণতা রয়েছে। এই রূপটিতে একটা পণ্য যে কতগুলো পণ্যের সাথে সমীকৃত ও তুলিত হতে পারে, তার কোন শেষ পাওয়া যায় না। ১নং পণ্য = ২ নং পণ্য = ৩নং পণ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ইত্যাদির কোন শেষ নেই। এটি যেন প্রাথমিক রূপটিই, শুধু পৃথক পৃথক সমীকরণগুলো একটা যুক্ত সমীকরণে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সমীকরণে আপেক্ষক একটি, তুল্য বহু। যখন একটি সাধারণ তুল্যের সাথে বহু অপেক্ষককে মূল্য প্রকাশ করতে দেখব, তখনই হবে মূল্য রূপের সম্পূর্ণতা অর্থাৎ 'বিতত রূপ' এর ক্রমটিকে বদলে যদি আমরা সমীকরণের দক্ষিণ পক্ষে একটা আপেক্ষক ও একটা তুল্যকে স্থাপন করতে পারি, তবেই আর অস্পষ্টতা থাকবে না। নীচের লেখ্যটির মাধ্যমে আমরা এই রূপটি প্রকাশ করতে পারি–

ব্যাপক রূপ

১ কোট ১০ পাউন্ড চা ৪০ পাউন্ড কফি ২ আউন্স সোনা	২০ গজ কাপড়

এই রূপটা প্রাথমিক রূপের চেহারাই বটে কিন্তু তা সবগুলোর চেয়ে ব্যাপক রূপ। এই রূপটা মূল্য রূপের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হয়েছে। এখানেই সর্বপ্রথম সব পণ্যগুলোর পক্ষে মূল্য হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। যাবতীয় পণ্য যখন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের ভিতরে মূল্য প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে তখন আর তাদের ভেতরে যে মূল্য-সম্বন্ধ রয়েছে, অর্থাৎ সব পণ্যই যে শ্রম-প্রসূত, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।

পূর্বের লেখ্যটিতে বস্ত্রের জায়গায় যদি সোনা স্থানান্তরিত হয়, তবে লেখ্যটির মৌলিক কোন পরিবর্তন না হলেও, নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটল—

২০ গজ কাপড় =

১ কোট =

এতখানি পর্যন্ত সব ব্যাপারটি আমাদের কাছে পরিষ্কার, অত্যন্ত সহজবোধ্য কিন্তু যখনই টেবিলকে পণ্যের রূপ দেওয়া হয় অর্থাৎ বাজারে বিনিময়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়, তখনই শুরু হয় মুশকিল। সুতরাং দেখা গেল, ব্যবহার মূল্য হিসাবে দ্রব্যের মধ্যে কোন গোলযোগ নেই, দ্রব্যের পণ্যরূপেই রহস্যটি দেখা দেয়। মানুষের শ্রম বিভিন্ন প্রকারে প্রযুক্ত হয়ে যাবতীয় দ্রব্য তৈরি করে এবং মূল্য সৃষ্টি করে। প্রকৃত পক্ষে এই বিষয়টার পশ্চাতে রয়েছে উৎপাদকগণের ভিতরের পরস্পর সম্বন্ধ।

প্রত্যেক উৎপাদকই এমন দ্রব্য প্রস্তুত করে যা তার কাজে না লেগে অপরের কাজে আসে; তাই তাদের পরস্পরের উপর নির্ভর করতে হয়। এভাবে উৎপাদন করতে হয় বলেই বর্তমান সমাজে উৎপাদনের পেছনে রয়েছে উৎপাদকে উৎপাদকে সম্বন্ধ। কিন্তু সাধারণত আমাদের প্রতীতি জন্মে যে, সম্বন্ধটা যেন সত্যি সত্যি পণ্যে পণ্যে সম্বন্ধ। মানুষই প্রকৃপক্ষে তার কল্পনা হতে দেবতাগণকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ তারা স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট বলে প্রতিভাত হয়। যা মানুষের সৃষ্টি তার কাছেই মানুষ আত্মসমর্পণ করে, তাকেই মানুষ পূজা দেয়। পণ্য সম্পর্কেও এটা খাটে। যা মানুষের হাতে গড়া, তাকেই আমরা রহস্যাবৃত মনে করছি, পূজা দিচ্ছি। মনে করছি, বাজারে এরা বুঝি স্বাধীনভাবে নিজেদের সম্বন্ধ পরিচালনা করে। বাজারে পণ্যের যে দর-দাম ঠিক হচ্ছে, তা বুঝি আপনা-আপনি হচ্ছে; মানুষে মানুষে সম্বন্ধ থেকে তা হচ্ছে না। আর হয়ত বা জিনিসের দাম কমেছে, বহু মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; আমরা মনে করে থাকি বাজারে এ সকল ঘটছে পণ্যের আপন খেয়াল হতে।

এই ব্যাপারটাকে মার্কস আখ্যা দিয়েছেন পণ্য ফেটিসিজম, অথবা পণ্য-পূজা; অর্থাৎ যা আমার সৃষ্ট, আমার সামাজিক সম্বন্ধাদি হতে যার চাল-চলন নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে আমরা স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট মনে করে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারীরূপে দেখে থাকি।

পণ্য-ফেটিসিজমের মূল আমরা দেখেছি। শ্রমের দ্বারাই পণ্য প্রস্তুত হয়। সামাজিক শ্রম-শক্তি এমনভাবে ব্যয়িত হয় যে, যে সব দ্রব্য বিভিন্ন লোকের শ্রমে প্রস্তুত হয়, সেগুলো উৎপাদন-কর্তার কাজে না লেগে লাগে অন্যের প্রয়োজনে। সুতরাং এসব দ্রব্যকে বাজারে আসতেই হয়। বাজারে আসলেই পণ্য উৎপাদন-কর্তার কথা শুনে চলার প্রয়োজন মনে করে না, দর-দাম এমন সূত্র অনুসারে ঠিক হয় যে উৎপাদন-কর্তার ইচ্ছার সাথে তার কিছুমাত্র সঙ্গতি নেই। তখনই আমাদের মনে হয় নিজের শক্তিতে, আপন ইচ্ছায় এবং স্বাধীনভাবেই বুঝি পণ্য চলে। এই ফেটিসিজম অন্যান্য প্রকারের উৎপাদন প্রণালীর ভিতর থাকতে পারে না। রবিনসন ক্রুশো আপন শ্রমশক্তি বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য প্রয়োগ করত–তার কাছে নিজের প্রস্তুত দ্রব্যগুলো মোটেই রহস্যাচ্ছন্ন ছিল না; নিজে প্রস্তুত করে নিজেই তা ভোগ করত। রবিনসন ক্রুশোর কথা অবশ্য কাল্পনিক। মধ্যযুগের ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা কি জানি? দাসেরা প্রভুর জন্য দ্রব্য প্রস্তুত করছে। মানুষের শ্রমেই যে সে দ্রব্য প্রস্তুত করছে, মানুষের শ্রমেই যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সে সম্পর্কে কারো কোনো সংশয় নেই। একান্নভুক্ত গোত্রশাসিত পরিবারে বা হিন্দু সমবায়ী জীবনে, পরিবারের বা সমবায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করান হতো, তারা সকলে মিলে সামাজিক শ্রম প্রসূত দ্রব্যগুলো ভোগ করত। এরূপ ব্যবস্থায় মানুষের সাথে তার তৈরি দ্রব্যগুলোর কোন রহস্যাবৃত সম্বন্ধ নেই। ভবিষ্যতের সমাজেও এই রহস্যটার কোন স্থান থাকবে না। কেননা, সেই সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার রীতি আমূল বদলে যাবে। সবার সম্মিলিত শ্রমশক্তি সমাজের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে ব্যয়িত হবে; বাজারে বিনিময়ের সাহায্য ছাড়াই দ্রব্যাদি সবার ভোগ-সম্ভোগের জন্য

ভিত্তিক হবে। এখানে দ্রব্য পণ্যেও পরিণত হয় না, বাজারে দর-দামের এবং বিনিময়েরও কোন স্থান থাকে না; এই কয়টি নিদর্শনেই আমরা দেখলাম এ সকল উৎপাদন রীতির ভিতরে বাজার ও বিনিময়ের যেমন কোন স্থান নেই, তেমনি দ্রব্য সম্পর্কেও কোন রহস্য বিন্দুমাত্র উপস্থিত হয়নি।

"সমাজের জীবন প্রক্রিয়া উৎপাদনেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। সুচিন্তিত পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদন-কাজ না চালালে উৎপাদনের উপর থেকে রহস্যের আবরণটা খসে পড়বে না।"

বিনিময়, মুদ্রা ও পণ্য সঞ্চালন
(Commodity circulation)

বাজারে যে সব উৎপাদনকারী পণ্যগুলো নিয়ে আসে তারা স্ব স্ব পণ্যের মালিক। তাদের বলা চলে ব্যক্তিগত বিত্তের অধিকারী। আইনের চোখে তাদের ভিতরের সম্পর্ক হলো চুক্তির সম্পর্ক। তারা পরস্পরের কাছে পণ্যের অধিকারী হিসেবেই পরিচিত। মালিকেরা বিভিন্ন ও পৃথক হলেও পণ্যগুলো পরস্পরের ভিতরে কোন প্রভেদ রাখে না, সব পণ্যই সব পণ্যের ভিতরে একই সত্তাকে খুঁজে পায়। মালিক তার আপন পণ্যকে নিজের কোন কাজে লাগাতে পারে না বটে, তবে এই পণ্য দিয়ে তার প্রয়োজনীয় যে কোন পণ্যকে সে হাত করতে পারে। তার নিজের পণ্য তার কাছে বিনিময়ের উপায় মাত্র। কোন পণ্যই আপন মালিকের কাছে ব্যবহার মূল্য নয়, অথচ অন্যের কাছে তা ব্যবহার মূল্য। এ কারণেই সব পণ্যকেই হাত বদল করতে হয়। এই হাত বদলকেই বলা হয় বিনিময়। বিনিময়ই এক পণ্যকে অন্য পণ্যের সাথে মূল্য সম্বন্ধ দাঁড় করায়। সুতরাং পণ্যসমূহকে ব্যবহার মূল্য হিসেবে ভোগ-সম্ভোগের জন্য হাতে পাওয়ার আগেই তাদের থাকা চাই মূল্য। অন্যদিকে মূল্য-সম্বন্ধে যাওয়ার আগেই তাদের ব্যবহার মূল্য থাকতে হবে।

সব পণ্য সব পণ্যের সাথে মূল্য-সম্বন্ধে আসতে পারে না, যদি না তারা সকলে একটি বিশেষ পণ্যকে সাধারণ তুল্য হিসেবে পৃথক করে রেখে তার সাথে সমীকৃত হয়। এই পণ্যই মুদ্রা।

বিনিময়ের জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন প্রত্যেককে হওয়া চাই তার আপন পণ্যের মালিক। কিন্তু আদিম সমাজে এই অবস্থাটা ছিলো না, তখন ব্যক্তিগত স্বত্ত্বের জায়গায় ছিল সাধারণ স্বত্ব। ইতিহাসে প্রথম বিনিময় দেখা দিয়েছে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়। "অতি আদিমকালে একটা গোষ্ঠী সমষ্টিগতভাবে অন্য গোষ্ঠীর সাথে দ্রব্য আদান-প্রদান করত। গোষ্ঠীর ভিতরের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিনিময় ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়েছে। কালক্রমে যখন সব দ্রব্যই বিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে লাগল, তখন থেকেই উপভোগের এবং বিনিময়ের দ্রব্যের ভিতর মস্ত প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে।"

দ্রব্য বিনিময়, অর্থাৎ বার্টারে দেখা যায়, প্রত্যেকটি পণ্যই তার মালিক কাছে বিনিময়ের উপায় এবং অন্যের কাছে তা একটি তুল্য। বার্টারে পণ্য বিশেষ ব্যবহার

মূল্য থেকে পৃথক ও স্বাধীন হয়ে সম্পূর্ণভাবে বিনিময়-মূল্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। বিনিময়ের বিকাশ হতে বিশেষ-পণ্য শুধুমাত্র বিনিময় মূল্য অথবা সাধারণ তুল্যরূপে পৃথক হয়ে পড়ে। সাধারণত দেখা যায়, যখনই একটা সম্পাদ্য আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তখনই তার সমাধানেরও উপায় আমরা পাই। কখনো কখনো দেখা যায়, যে সাধারণ তুল্যটি আজ কাজ করছে, কাল হয়ত বা তার জায়গায় অন্য একটা দেখা দেবে। ধীরে ধীরে বিনিময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ পণ্যই এই সাধারণ তুল্যরূপটি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেছে। বিনিময়ের পরিসর যতই বৃদ্ধি পেল, সোনা-রূপা প্রভৃতি ধাতব পদার্থই এই সাধারণ তুল্য হয়ে দাঁড়াল। সোনা এবং রূপাকে প্রকৃতি কখনো মুদ্রার রূপ দিয়ে পাঠায় নি, সামাজিক বিষয় হতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সোনা-রূপাকেই মুদ্রায় পরিণত হতে হয়েছে। অবশ্য মুদ্রারূপে কাজ করার জন্য সোনা-রূপার এমন কতগুলো প্রাকৃতিক গুণাগুণ রয়েছে যা অন্য পণ্যের নেই।

সোনাকে যতই আমরা টুকরো টুকরো করে ভাগ করি না কেন, এর বিভিন্ন টুকরোয় একই গুণ রয়েছে। মুদ্রার পণ্যটিকে আমরা ইচ্ছেমতো বিভাগ বা সংযোগ করতে পারি বলেই মুদ্রাই উপযুক্ত সাধারণ তুল্য হতে পারে। অন্য কোন পণ্যকে যদি টুকরো টুকরো করি তবে তা মূল্যহীন হয়ে পড়তে পারে। টুকরোগুলোকে যদি একত্রে সংযুক্ত করি তবু তার পূর্ব উপযোগিতা ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না। সোনাকে টুকরো টুকরো করেও আবার যদি সেগুলো একত্র করি, তার পূর্ব মূল্য আমরা অক্ষুন্নভাবেই পাই।

সমস্ত পণ্যেরই মূল্য মুদ্রার ভিতরে প্রতিফলিত হয়। মুদ্রা একটি পণ্য-এই আবিষ্কার নতুন নয়। বিনিময় ঘটনাটি মুদ্রাকে সকল পণ্যের মূল্য-রূপে পরিণত করে। কিন্তু বিনিময় হতে তার মূল্য সৃষ্টি হয়নি। শ্রম-প্রসূত বলেই এটা মূল্য। মুদ্রা বিনিময়ে আসার আগে থেকেই মানুষের শ্রম-প্রসূত; বিনিময়ে এসেও তা বহুকাল পণ্য হিসাবেই ছিল, তুল্যের স্থান নিতে পারেনি। সোনার মুদ্রা-রূপ কিভাবে হলো তার ইতিহাস আমরা আগে দেখেছি। মুদ্রার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, সব পণ্যকেই মূল্য হিসাবে প্রকটিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। এই কারণে মুদ্রা সব পণ্যেরই মূল্যের পরিমাপক।

সব পণ্যই মানুষের শ্রম-প্রসূত; তাই পণ্যগুলোর ভিতরে পরস্পর তুলনা চলতে পারে। এদের ভিতরের সাধারণ বস্তুটিরই বাহ্যিক ও সার্বজনীন রূপ হলো মুদ্রা। সোনায় যে কোন পণ্যকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা চলতে পারে–

ক পণ্য ঘ = খ মুদ্রা; খ পরিমাণ মুদ্রা হলো পণ্যের বাজারদর। এক টন লোহা = ২ আউন্স সোনা, এই সমীকরণে লোহার মূল্য প্রকাশ করছে। মূল্যের এই প্রকাশ দ্বারা সুবিধা হলো যে, যে কোনো দ্রব্যকে বাজারে এনে বিক্রয় করার পূর্বেই তার বাজারদর নিরূপণ করে দেওয়া চলতে পারে।

প্রথমই আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন ; সোনার মূল্যের তারতম্য হলেও বাজার দরের মান (standard of price) হিসাবে তার কোন পরিবর্তন হয় না। মূল্য যেমনই পরিবর্তন হোক না কেন, সোনার বিভিন্ন অংশের ভিতর একটা সমানুপাত রয়েছে।

মূল্য হয়ত বা অর্ধেক হয়ে গেছে; কিন্তু ১২ আউন্স সোনা সব সময়ই এক আউন্সের বার গুণ থাকবে। সুতরাং মূল্যের দিক থেকে সোনা যতই পরিবর্তনশীল হোক না কেন, বাজারদরের মান হিসেবে তা অপরিবর্তনীয়। দ্বিতীয়ত সোনার মূল্যের পরিবর্তন হলেও মূল্যের পরিমাপ হিসাবে এর কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় না। কেননা, এর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব পণ্যেরই বাজারদর পরিবর্তন হবে।

এক আউন্স সোনাকে বিভাগ করে তার বিভিন্ন অংশের নাম দেয়া হলো পাউন্ড, শিলিং ইত্যাদি। এখন আর পণ্যের দর এক আউন্স সোনা না বলে এক আউন্স সোনায় যত পাউন্ড শিলিং হয় তাই বলা হবে অর্থাৎ এক আউন্স সোনাকে বলি তিন পাউন্ড সতের শিলিং সাড়ে দশ পেন্স। এখন প্রশ্ন উঠবে, বাজার দর কি সব সময়ই মূল্যকে প্রকাশ করতে পারে? ধরা যাক, এক পাউন্ড গম ও ২ পাউন্ড সোনা উৎপাদনে সমান শ্রম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দুই-ই সমান মূল্যের। এখন বাজারে অবস্থার তারতম্য হওয়াতে যদি এক কোয়ার্টার গমের বাজারদর তার প্রকৃত মূল্যের সমান না থেকে ৩ পাউন্ড অথবা ১ পাউন্ড হয়ে দাঁড়ায় তা হলে এই দুটি দর একবার মূল্য থেকে বেশি এবং অন্য সময়ে মূল্য থেকে কম হয়ে পড়ে। এই বাজার দর বাড়ুক বা কমুক, উৎপাদনের অবস্থার কোনোরকম তারতম্য না হওয়া পর্যন্ত এক কোয়ার্টার গমের মূল্য ঠিক আগের মতোই রয়ে গেল। মূল্য এবং বাজারদরের এই প্রভেদ বিনিময় প্রথায় অত্যন্ত স্বাভাবিক। মূল্য এবং বাজার দরে এই পরিমাণাত্মক প্রভেদই যে সংঘটিত হয় তা নয়, এও দেখা যায় যে, যে জিনিসের একেবারেই কোন মূল্য নেই অর্থাৎ এর উৎপাদনে মানুষের শ্রম প্রয়োজন হয় না, তেমন জিনিসেরও বাজার দর আছে। এখানকার এমনই সামাজিক ব্যবস্থা যে, মানুষের মান-সম্মান বিবেক প্রভৃতিও বাজার দরে বিক্রি হয়। এদের তো আর মূল্য নেই।

বিনিময় একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। যার কাছে পণ্য ব্যবহার মূল্য নয়, তার হাত থেকে যে ব্যক্তির কাছে তা ব্যবহার মূল্য, পণ্য তার হাতে যায়। পরবর্তী লোকের কাছে গেলেই তা ব্যবহারে লাগবে। পণ্যগুলো প্রথমত পণ্য হিসাবেই বিনিময়ে আসে। ধীরে ধীরে তাদের একটি পৃথক হয়ে পড়ে ও মুদ্রার রূপ নেয়। তখন মুদ্রাই হয়ে পড়ে একমাত্র বিনিময় মূল্য, আর সবগুলো ব্যবহার মূল্য।

বাজারে আমরা কি দেখি? বিশ গজ কাপড় ২ পাউন্ডে বিক্রি করার জন্য একজন মালিক বাজারে উপস্থিত হলো। কাপড় বিক্রি করে সেই মুদ্রায় সে একটা বাইবেল কিনল। প্রথম পণ্যটি মুদ্রায় বিক্রি হলে পরে সেই মুদ্রাকে পরিবর্তিত করা হলো অন্য একটি পণ্যে। প্রথম পণ্যের মালিক বাজারে দুটি বিভিন্ন প্রকারের কাজ করল—প্রথম বেচা তারপর কেনা। ক্রয়-বিক্রয় দুটি আলাদা আলাদা কাজ হলেও দুয়ের ভিতর একটা ঐক্য রয়েছে; কেননা বিক্রি করা হচ্ছে ক্রয়ের জন্যে। একটা পণ্যের জায়গায় আর একটা পণ্য এলো সত্যি; কিন্তু মূল্যের দিক থেকে কি সে লাভবান হতে পেরেছে? মোটেই না, মূল্য তার হাতে আগের মতোই রয়েছে, শুধু রূপান্তর হয়েছে পণ্যের। এই ঘটনাকে এখন আমরা নীচের লেখ্যটি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি–

পণ্য	মুদ্রা	পণ্য
প	ম	প

সমস্ত প্রক্রিয়াটার অবশ্য মোট ফল প-প; পণ্যের পরিবর্তে পণ্যই সংগ্রহ হয়েছে। ম অর্থাৎ মুদ্রা শুধুমাত্র মধ্যস্থর কাজ করেছে। এই মুদ্রা যখন শেষ পণ্যটির মালিকের হাতে এসে পড়বে, সে তখন অন্য ব্যক্তিকে এই মুদ্রা দিয়ে তার ব্যবহারোপযোগী পণ্য কিনবে– এভাবে মুদ্রা ক্রমেই এক ব্যক্তির হাত থেকে অন্য ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ছে। মুদ্রা বাজার ও বিনিময় প্রক্রিয়ার ভিতরে থেকে সর্বদা মধ্যস্থর কাজ করে যাচ্ছে, অথচ পণ্যগুলো হাতবদল করে ক্রমেই বাজার থেকে সরে পড়ছে। মুদ্রা একটি প-ম-প প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অপর প-ম-প প্রক্রিয়ায় ঢুকছে। সর্বপ্রথম মুদ্রা যার হাতে ছিলো, ক্রমেই তার কাছ থেকে সরে দূরে যাচ্ছে। এই ক্রমাগত সরে যাওয়াকেই বলা হয় মুদ্রার কারেন্সী। সব পণ্যই বাজারে আসে বাজার থেকে অপক্রান্ত হওয়ার জন্য, কিন্তু মুদ্রা বিনিময়ে আসে বিনিময়েই থাকার জন্য। বিনিময়ে মুদ্রার এই ক্রমিক অবস্থিতির জন্য মনে হয় মুদ্রাই যেন পণ্যের চলাচলের কারণ; কিন্তু কি করে একটি বিশেষ পণ্য মুদ্রা-রূপ গ্রহণ করল তার ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখছি, পণ্যের চলাচল ও বিনিময় থেকেই বিশেষ একটা অবস্থায় মুদ্রার আবির্ভাব হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনো একটা বিশেষ দিনে বাজারে কতো মুদ্রার প্রয়োজন হবে? বাজারে যে পরিমাণ পণ্য এসেছে, তাদের মোট বাজার দর যতখানি, ততখানি হবে মুদ্রার প্রয়োজন। পণ্যে মূল্য যদি অপরিবর্তনীয় থাকে কিন্তু সোনার দর যদি কমে, তবে পণ্যের বাজার-দর বাড়বে। মোট মুদ্রার পরিমাণও সেভাবে বাড়বে। আবার সোনার মূল্য বাড়লে পণ্যের বাজার-দর কমবে, সঙ্গে সঙ্গে মোট মুদ্রার পরিমাণও কমবে। সুতরাং দেখা গেল, পণ্যের মোট পরিমাণ যদি একই থাকে তবে সোনার মূল্যের তারতম্যের ফলে বাজার দর বাড়লে বেশি মুদ্রার প্রয়োজন হবে আর বাজার দর কমলে কম মুদ্রার প্রয়োজন হবে। ধরা যাক, চারটে পণ্য একই সময়ে বিক্রি হয়েছে; সেগুলোর প্রত্যেকটির বাজার-দর দুই পাউন্ড; তা হলে বাজারে প্রয়োজন হবে মোট আট পাউন্ড। কিন্তু চারটা পণ্য যদি একটা ক্রম অনুযায়ী একের পর এক বিক্রি হয়, তাহলে তাদের মোট বাজার দর আট পাউন্ড হওয়া সত্ত্বেও বাজারে মাত্র দুই পাউন্ডে কাজ চলতে পারে। এক কোয়ার্টার গম—২ পাউন্ড—২০ গজ কাপড়-২ পাউন্ড-১ বাইবেল; কেনা বেচার ক্রমটি তখন হবে ঠিক এভাবে। ২ পাউন্ড তাহলে চারবার হাত ঘুরল; এই হাত ঘোরাকে বলব মুদ্রার গতিবেগ (Velocity); মুদ্রা কতবার হাত ঘুরছে তা হতে মুদ্রার গতিবেগ নির্ণীত হবে। আমরা ধরলাম, মুদ্রার গতিবেগ ৪। মোট বাজার দর ও মুদ্রার বেগ জানা থাকলেই আমরা কোন একটা সময়ে কত মুদ্রার প্রয়োজন হবে তা জানতে পারি। মুদ্রার বেগ যতই বাড়বে, ততই কম মুদ্রার প্রয়োজন হবে, আবার গতিবেগ কমলে মুদ্রার প্রয়োজন বেশি হবে।

মুদ্রার চলাচল যেমন পণ্যের হস্তান্তর অর্থাৎ বিক্রয় ও ক্রয় দুটি ঘটনার যোগাযোগের পরিচায়ক, মুদ্রার গতিবেগ তেমনি কত তাড়াতাড়ি পণ্যগুলো তাদের রূপ পরিবর্তন করছে তারই প্রকাশক। মুদ্রার চলাচল যখনই বাধা পায় তখন আর এরূপ পরিবর্তন এতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় না। সমাজের দ্রব্য আদান-প্রদানের কাজ

তখন নিশ্চল হয়ে পড়ে। এই নিশ্চলতার কারণ আমরা পণ্য সঞ্চালনের (circulation) ভিতর খুঁজে পাই না, পণ্য সঞ্চালন শুধু এই ঘটনাকে আমাদের সামনে ধরিয়ে দেয়। যখনই আমরা দেখব বিক্রয়ের পর ক্রয় আর সম্ভব হচ্ছে না, সবাই শুধু বিক্রির জন্য প্রস্তুত করে, কেউই ক্রয় করতে চাচ্ছে না, ফলে ক্রয়-বিক্রয় দুই-ই নিশ্চল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সমাজ সঙ্কটের সম্মুখবর্তী। বাজারে শুধু আমরা এই ঘটনাটাই বুঝতে পারি; কারণ অনুসন্ধান করতে আমাদের যেতে হবে অন্যত্র। সমাজের উৎপাদন প্রণালীর ভিতরের অব্যবস্থাই এরূপ সঙ্কটের জন্য দায়ী। এই সঙ্কট-সময়ে পণ্য বিক্রি হয় না বলে মুদ্রা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, তার গতিবেগও কমে যায়। সাধারণ লোকের ধারণা, এই সঙ্কটের কারণ বুঝি মুদ্রার অভাব, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করলে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ সম্ভব হবে।

মুদ্রা তৈরি রাষ্ট্রের কাজ। জাতীয় মুদ্রা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিভিন্নতা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পণ্য চলাচলের গণ্ডী দুই রকম—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। কিন্তু সোনার মুদ্রারূপ দেশভেদে পাউনণ্ড অথবা ডলার নামে চলে। তবে সোনা সোনারূপে চলে সর্বত্র। আমেরিকাকে যদি ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা দিতে হয় তবে পাউন্ড দিলে চলবে না, পাউন্ডকে গলিয়ে এক ডলারে যত সোনা ততখানিই দিতে হবে। তবেই দেখা যায়, বিদেশে ঋণ শোধের জন্য মুদ্রা পাঠাতে হলে জাতীয় মুদ্রাকে গলিয়ে সোনা করতে হবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রার ভিতর তাহলে প্রভেদ হল শুধু চেহারাটাই।

মুদ্রা যখন কারেন্সী হিসাবে নিরন্তর কাজ করবে, তখনই ধীরে ধীরে তার ধাতুর ঘাটতি পড়তে শুরু করে। নামে হয়ত বা একটা পাউন্ড মুদ্রা পাউন্ড মুদ্রাই রইল; কিন্তু বস্তুত তার ভিতরে এক পাউন্ড মুদ্রায় যতোখানি সোনা থাকা প্রয়োজন তা থাকল না। সুতরাং একই নামের মুদ্রার ভিতর মূল্যের পার্থক্য ঘটল। পণ্য চলাচলের ভিতরে এই ব্যাপারটি অবশ্যম্ভাবী, রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত আইনের সাহায্যে স্থির করে দিতে বাধ্য হয় যে, ধাতুর ঘাটতি পড়লেও অন্তত একটা বিশেষ মাত্রায় সোনা মুদ্রার মধ্যে থাকা চাই-ই। এই ক্ষয়প্রাপ্তির জন্য এক পাউন্ডের ওজন কমল বটে; কিন্তু তা এক পাউন্ডেরই একটা মুদ্রার মতো কাজ করে যাচ্ছে। যে মুদ্রায় ধাতুর ঘাটতি পড়েছে, তা-ও আসল মুদ্রারই কাজ করে যাচ্ছে। যা যথার্থ নয় তা দিয়ে যা যথার্থ তার প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হলো। এই সত্যটা থেকে ধীরে ধীরে শুরু হলো নির্দেশক মুদ্রার (Token money) প্রচলন। অর্থাৎ সবখানিই আসল ধাতু না থাকলেও চলবে, মুদ্রার একটা বিশেষ অংশ খাদ থাকলেও হতে পারে। ধীরে ধীরে একেবারেই যার মূল্য নেই তার দ্বারা আসল মুদ্রার কাজ চালানোর ব্যবস্থা হলো ঃ যেমন 'কাগজী নোট'। বাজারে চাহিদার পরিমাণে যে মুদ্রা প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন কাগজী নোট তার বেশি চালানো যায় না। যদি তার বেশি কাগজী নোট পাঠাই তবে কি হতে পারে? এক আউন্স সোনাকে ধরা যাক যেন চার পাউন্ড মুদ্রায় পরিণত করা যায়, সুতরাং প্রতি পাউন্ডে রয়েছে এক চতুর্থাংশ আউন্স সোনা। বাজারে যদি থাকে এক পাউন্ড মুদ্রার প্রয়োজন এবং সে জায়গায় যদি আমরা ১ পাউন্ডের একটি কাগজী

নোট না পাঠিয়ে দুটি কাগজী নোট পাঠাই, তবে একটি কাগজী নোট ১ পাউন্ড মুদ্রার ভিতরে যে সোনা আছে তার প্রতিনিধিত্ব না করে করবে $\frac{১}{৮}$ আউন্স সোনার প্রতিনিধিত্ব। যে সব পণ্যের মূল্য আগে এক পাউন্ডের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হতো তা এখন ২ পাউন্ড কাগজী নোটে প্রকাশিত হবে। কাগজী নোট মুদ্রারই নির্দেশক ছাড়া আর কিছু নয়। সোনা যখন মুদ্রারূপে বিনিময়ের কাজ করে, তখনই শুধু কাগজী নোট তার জায়গায় বসতে পারে, অন্য সময়ে নয়।

আজ-কালকার বাজারে দেখা যায়, কোটি কোটি মুদ্রার জিনিস কাটতি হচ্ছে। বাজারে এতো মুদ্রার যদি নগদ প্রয়োজন হয়, তা হলে কিছুতেই বিপুল কাজ-কারবার চলতে পারত না। বাকীতে পণ্য বিক্রি হতে পারে বলেই কাজ-কারবার চলতে পারে। বিনিময় প্রথা যখন দ্রব্য বিনিময় স্তরে ছিলো তখন বাকী কাজ-কারবারের কথাই উঠত না। মুদ্রার আবির্ভাব হওয়াতেই পণ্যের হিসাব রাখার সুব্যবস্থা হয়েছে; এরূপ হয়েছে বলেই বাকী দিয়েও দুই দিন বাদে মূল্য ফেরত পাওয়া যাবে, বিক্রেতা এটা মনে করতে পারে। 'ক' হয়ত বা এক পাউন্ডের জিনিস 'খ' কে দিয়েছে 'খ' নগদ মূল্য না দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিল দশদিন বাদে সে ঋণ শোধ করবে। মুদ্রায় শুধু হিসাবই রাখা হলো, এদিন বাজারে মুদ্রার নগদ চলাচল প্রয়োজন হলো না। এভাবে উদ্ভব হলো ক্রেডিট মুদ্রার। নীচে একটা বিশদ উদাহরণ দেওয়া গেল।

একটি ফার্ম অন্য একটি ফার্মের কাছ থেকে লক্ষ পাউন্ডের জিনিস কিনে তাকে একটি প্রতিশ্রুতিপত্র দিলো যে, এক মাসের মধ্যে ফার্ম ঋণ শোধ করবে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ফার্ম তৃতীয় একটি ফার্মের কাছ থেকে লক্ষ মুদ্রার জিনিস কিনল এবং এর বদলে ফার্মকে প্রথম ফার্ম থেকে পাওয়া প্রতিশ্রুতি পত্রে নিজের সই স্বাক্ষর দিল। তৃতীয় ফার্ম চতুর্থ একটা ফার্মের একই মূল্যের জিনিস কিনে দ্বিতীয় ফার্ম থেকে পাওয়া প্রথম ফার্মের দেয়া প্রতিশ্রুতি পত্রটায় নিজের স্বাক্ষর করে দিল। শেষোক্ত ফার্ম একমাস বিগত হওয়ার আগেই প্রথম ফার্মটির কাছে নির্দিষ্ট দিনের প্রতিশ্রুতি পত্রটি সহ উপস্থিত হয়ে এক লক্ষ পাউন্ড আদায় করে নিল। এই দৃষ্টান্তটি থেকে দেখলাম, তিন লক্ষ পাউন্ডের কাজ হয়েছে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দিনে নগদ টাকার প্রয়োজন হলো মাত্র এক লক্ষ পাউন্ড। এই একমাসের ভিতরে চতুর্থ ফার্মটি যদি প্রথম ফার্মের কাছ থেকে এক লক্ষ পাউন্ডের জিনিস কিনে থাকে তা হলে চার লক্ষ পাউন্ডের কাজ কারবার হলো, অথচ বাজারে নগদ মুদ্রার একেবারেই প্রয়োজন হলো না। এইভাবে কোটি কোটি মুদ্রার কাজ কারবার প্রতিদিন চলছে। যদি এই মুদ্রা ক্রেতাদের নগদ দিতে হতো, তাহলে উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য কখনো বিপুল আকার হতে পারতো না। এই প্রতিশ্রুতিপত্রকে বলা হয় প্রমিশরী নোট (Promissory note)।

মুদ্রার পুঁজিতে পরিবর্তন

পণ্যের চলাচল থেকেই পুঁজির সূত্রপাত। বাণিজ্যই হলো পুঁজির ঐতিহাসিক ভিত্তি। ১৬ শতকে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ও পৃথিবীব্যাপী বাজারের সৃষ্টি থেকেই পুঁজির আধুনিক ইতিহাস শুরু হয়েছে।

সর্ব প্রথম মহাজন ও ব্যবসায়ীর মুদ্রাই পুঁজিরূপে প্রকটিত হয়। মুদ্রা পুঁজি না হয়ে শুধু মুদ্রাই থাকতে পারে। কিংবা মুদ্রা পুঁজিতেও পরিণত হতে পারে। এই দুয়ের প্রভেদ প্রথম দেখা যায়, পণ্য চলাচল কিভাবে হয় তার ভিতর। এই চলাচলের সরল রূপটি হলো প-ম-প; পণ্য মুদ্রায় পরিণত হয়ে আবার পণ্যেই ফিরে আসে। এরূপ চলাচলে বিক্রয় হয় ক্রয়ের জন্য। পণ্য চলাচলের অন্য আরেকটি রূপ রয়েছে। ম-প-ম, এই রূপে মুদ্রা নিজে পণ্যে পরিণত হয়, পরে পুনরায় পণ্য মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়াটিতে দেখা যায়, আসলে ক্রয়-করা হয় বিক্রির জন্য। দ্বিতীয় রূপটিতে মুদ্রা সঞ্চালনের ফল হলো মুদ্রার পুঁজিতে পরিণতি।

ম-প এবং প-ম এই দুয়ের সংযোগে দেখা যায় মুদ্রাকে যেমন পণ্যে পরিণত করা হয়, তেমিন পণ্যকেও আবার মুদ্রায় পরিবর্তিত করা হয়। সুতরাং ম-প-ম এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ম-ম; মুদ্রা থেকে শুরু করে আমরা মুদ্রাতেই পৌছাই। একশ পাউন্ডে ৩ টন তুলা কিনে যদি তা ১১০ পাউন্ডে বিক্রি করি, তবে প্রকৃতপক্ষে ১০০ পাউন্ডকে ১১০ পাউন্ডে পরিবর্তিত করলাম। সুতরাং মুদ্রায় মুদ্রাই পাওয়া গেল।

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই ১০০ পাউন্ডকে যদি ১০০ পাউন্ডে পরিণত করা আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে ম-প-ম প্রক্রিয়াটি নিরর্থক হয়ে পড়ে। সমান সংখ্যক কিংবা বেশি বা কম পরিমাণে মুদ্রার সাথেই বিনিময় হোক না কেন, এই মুদ্রা যেসব রূপান্তরের ভিতর দিয়ে গেল তা সম্পূর্ণ নতুন ও মৌলিক।

কৃষক যেভাবে বিনিময় করে, এই প্রক্রিয়া তা হতে সম্পূর্ণ অন্য রকম। কৃষক হয়তোবা তার উৎপাদিত শস্য বিক্রি করে কাপড় কিনল; কিন্তু এই প্রক্রিয়া তা-না। এখন আমাদের দেখতে হবে পণ্য চলাচলের এই দুটি রূপ অর্থাৎ প-ম-প ও ম-প-ম-এর মূলগত প্রভেদ কোথায়।

দুটির ভিতরেই ক্রয় ও বিক্রয় দুই-ই আছে। দুটির ভিতরেই পণ্য এবং মুদ্রা দুই-ই রয়েছে। দুটির ভিতরেই বিক্রেতা এবং ক্রেতা দুই-ই বর্তমান। কিন্তু দুটোর ক্রম ও গতি বিভিন্ন। একটা পণ্য থেকে শুরু করে পণ্যে পরিণত হয়েছে, অন্যটি মুদ্রা দিয়ে শুরু করে মুদ্রাতেই গিয়ে ঠেকেছে। ম-প-ম ক্রমটি প্রথমে উদ্দেশ্যহীন বলেই ঠেকে, কেননা মুদ্রা যখন মুদ্রাতেই পরিণত হয় তখন আমরা শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবহার মূল্য পেলাম না, মুদ্রা তো প্রথম থেকেই হাতে ছিল। গোড়ায় এবং শেষে দুই জায়গাতেই মুদ্রার উপস্থিতি রয়েছে বলে এদের ভেতর গুণাত্মক প্রভেদ মোটেই কিছু নেই; দুটি দুই রকমের ব্যবহার মূল্যের ভেতর যেমন প্রভেদ রয়েছে, এদের ভেতর সেই প্রভেদটুকু নেই। তবে দুয়ের ভেতরে অর্থাৎ প্রথম মুদ্রা ও শেষের মুদ্রার ভেতরে গুণাত্মক প্রভেদ না থাকলেও পরিমাণাত্মক প্রভেদ রয়েছে। গোড়ায় যে পরিমাণ মুদ্রা খাটানো হয়েছিল, তার চেয়ে এখন বেশি পরিমাণ মুদ্রা বাজার থেকে তুলে আনা হলো। তা হলে এই প্রক্রিয়াটির প্রকৃত রূপ ম-প-ম নয়, ম-প-ম অর্থ ম+ম = মূল পুঁজি+ বর্ধিতাংশ। এই বর্ধিতাংশকেই বলা হয় উদ্বৃত্ত মূল (Surplus value)। প্রথমের মূল্যটা অক্ষুন্ন তো থাকলই, তাছাড়াও তার আয়তনও বৃদ্ধি পেল। এই প্রক্রিয়াটাই মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করে। প-ম-প অর্থাৎ ক্রয়ের জন্যে যে বিক্রয় তার একটা উদ্দেশ্য থাকে যে, যে ব্যবহার মূল্য আমার হাতে আছে, তাকে পরিবর্তিত করে নিতে হবে আমার ব্যবহারোপযোগী অন্য একটি ব্যবহার মূল্যে।

এই উদ্দেশ্যটা সাধিত হয় বিনিময় প্রক্রিয়াটা থেকে সরে এসে তবে। কিন্তু যখন আমরা বিক্রির জন্য ক্রয় করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে ব্যবহার মূল্য নয়, বিনিময় মূল্য; কম মুদ্রা খাটিয়ে তাকে বেশি মুদ্রায় পরিণত করতে হবে। বিনিময় মূল্যই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে তাকে বাজার থেকে সরিয়ে না এনে বারবার খাটিয়ে বড় করাটাই হয় কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ম-প-ম প্রক্রিয়াটা নিরন্তর কাজ করেই চলেছে, তার কোথাও বিরতী নেই। ম-প-ম একবার সম্পন্ন হয় পুনরায় শুরু হওয়ার জন্যেই। সরল পণ্য চলাচল প্রক্রিয়ার ভেতরে অর্থাৎ প-ম-প'র ভেতরে উপযুক্ত ব্যবহার মূল্য পাওয়াই থাকে উদ্দেশ্য। মূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি সংঘটিত হতে পারে শুধুমাত্র এই পৌনঃ পুনিক ম-প-ম বিনিময় প্রক্রিয়ার ভেতরেই। পুঁজির চলাচলের তাই কোনো শেষ নেই। পুঁজিপতির পকেট থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পুঁজির বর্ধিতায়ন হয় এবং পুনরায় তার পকেটেই ফিরে আসে। পুঁজিপতির কাছে যেমন ব্যবহার মূল্য কাঙ্ক্ষিত নয়, তেমনি একবার মাত্র পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে ক্ষান্ত হওয়াও তার লক্ষ্য হতে পারে না। অবিরাম মুনাফা অর্জনই তার একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। ধনের জন্য অপরিসীম লোভ—এই বিষয়ে পুঁজিপতির সাথে কৃপণের যথেষ্ট মিল রয়েছে। পুঁজিপতি কৃপণ হলেও যুক্তিবাদী। কৃপণ যা পায় তাকে আগলিয়ে থাকে, পুঁজিপতি অর্থকে খাটিয়ে তা বাড়াতেই সচেষ্ট থাকে।

একই মূল্যের বিভিন্ন আকার রয়েছে। কখনো পণ্য হিসেবে, কখনো বা মুদ্রা হিসেবে তা প্রকাশিত হয়। ম-প-ম এর ভেতরে মুদ্রা এবং পণ্য একই মূল্যের বিভিন্ন অবয়ব মাত্র। অবশ্য মুদ্রা মূল্যের সাধারণ রূপ, পণ্যমাত্র বিশেষ রূপ। মূল্য এক রূপ ত্যাগ করে অন্য রূপ পরিগ্রহ করছে, কিন্তু তাতে মূল্যের কিছুমাত্র মূল্যহানি হচ্ছে না, শুধু চেহারারই রূপান্তর ঘটছে। এইভাবে বারবার রূপ পরিবর্তন করে পরিশেষে আপন দেহ হতে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে মূল্য একটি সক্রিয় সত্তা হয়ে উঠেছে। এই সক্রিয়তার জন্যেই মূল্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কখনো বা পণ্যের, কখনো বা মুদ্রার রূপ নিয়ে নিজেকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে মূল্য সতত ক্রিয়ারত অবস্থায় থাকে বলেই তা একটি স্বাধীন রূপ চায়। মূল্য মুদ্রাকে অবলম্বন করে মুদ্রাতেই গিয়ে শেষ হয়, এই মুদ্রাই মূল্যের স্বাধীন ও সহজ পরিচয়।

বিক্রয় করার জন্যে যে ক্রয়, সঠিক করে বলতে গেলে, বেশি দামে বিক্রি করার জন্যে যে ক্রয়, তা শুধু ব্যবসায়ী পুঁজির বেলায়ই খাটে। কারখানা পুঁজি ও মুদ্রা মিলে এই মুদ্রাকে পণ্যে পরিণত করে এবং পণ্যকে বাজারে বিক্রি করে পুনরায় তাকে মুদ্রায় পরিণত করা হয়।

যাই হোক, পণ্য চলাচলের ভিতর আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই, ম-প-ম পুঁজি বৃদ্ধির একটা ব্যাপক আবরণ সূত্র।

উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে সৃষ্টি হয়?

দেখা গেল যে বিনিময় দ্বারা দুই পক্ষই লাভবান হচ্ছে; কেননা, যার হাতে তার নিজের ব্যবহারোপযোগী কোনো জিনিস ছিলো না, তা তার হাতে আসল। তা ছাড়া, আরো এক রকমের লাভ হয়। প্রত্যেকে দুই রকম জিনিস তৈরি না করে যদি একটা জিনিস তৈরিতেই মনোনিবেশ করে তা হলে মোট উৎপাদন হবে অনেক বেশি। ধরা যাক 'ক' এর চাল প্রস্তুত করতেই বেশি সুবিধা এবং খ এর ডাল প্রস্তুতের সুবিধা

বেশি। এই অবস্থায় যদি ক এবং খ প্রত্যেক চাল এবং ডাল দুই-ই প্রস্তুত না করে যার যে ব্যবহার মূল্য প্রস্তুত করতে সুবিধা বেশি তাই করে তা হলে প্রতি সপ্তাহে ১০ মন চাল ও ১৫ মন ডাল উৎপাদন হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি উভয় দ্রব্য উৎপাদন করতে যায়, তা হলে ক হয়ত বা ৪ মণ চাল ও ৫ মন ডাল এবং খ ২ মন চাল ও ১৫মন ডাল উৎপাদন করতে পারে। এই অবস্থায় মোট প্রস্তুত হবে ৬ মন চাল ও ১২ মন ডাল। আগের অবস্থায় উৎপাদন করলে মোট উৎপাদন বেশি হবে। বিনিময়ের ভেতর না গিয়ে প্রত্যেকেই সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবহার মূল্য প্রস্তুত করতে গেলে প্রত্যেকের উৎপাদন কম হতে বাধ্য। বিনিময় আছে বলেই অধিক ব্যবহার মূল্য উৎপাদন হলো। এখানে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমরা ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্যের ভিতর গোল না করি। লক্ষ্য রাখতে হবে, ব্যবহার মূল্য দুই পক্ষই বেশি পেলেও, বিনিময় মূল্যের দিক থেকে কারো কিছু লাভ হলো না। বিনিময়ের মারফৎ যতখানি মূল্য একপক্ষ অন্য পক্ষকে দিয়েছে ততখানিই আবার বিনিময়ে সে পেয়েছে। প-ম-প প্রক্রিয়ার ভেতরে প্রথম আমার হাতে যে পরিমাণ পণ্য ছিলো, পরে ঠিক ততখানি মূল্যেরই মুদ্রা আমি পেলাম। তারপর মুদ্রা দিয়ে যখন পণ্য কিনলাম, তখনও মূল্যের পরিমাণ আমার হাতে সমানই রইল। মূল্যের রূপ নানাভাবে পরিবর্তিত হলো সত্যি, কিন্তু মূল্যের পরিমাণ রয়ে গেল ঠিক একই রকম। পণ্য চলাচলের ভেতর বিনিময় হয় সমান মূল্যের; সুতরাং, সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি, পণ্য চলাচলের ভেতরে কখনো উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না। কণ্ডিলেক বলতেন, এটা সম্পূর্ণই ভুল সিদ্ধান্ত যে, আমরা সমান সমান মূল্যের ভেতরে বিনিময় করে থাকি। বিনিময় হয়ে থাকে আমার যে জিনিস আমি ব্যবহার করি না, তার সাথে অন্য একজনের জিনিস, যা আবার তার ব্যবহারে লাগে না। সুতরাং কণ্ডিলেকের মতে, যা কম মূল্যবান তার বিনিময় হয়ে থাকে যা বেশি মূল্যবান তার সাথে। এটা কি সমানে সমানে বিনিময়? এই ধরনের যুক্তির ভেতর স্পষ্টই দেখছি, ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্যের ভেতর গোল করা হয়েছে।

এখন দেখা যাচ্ছে, সমান মূল্যের দুটি পণ্যের ভেতরই যদি বিনিময় হয়, তাহলে উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব হবে কোথা থেকে? প্রকৃতপক্ষে বিনিময় হবে সমানে সমানে। ধরা যাক, যেন বিনিময় হলো অসমান মূল্যের ভেতরে।

বিক্রেতা ১০ পাউন্ড মুনাফায় ১০০ পাউন্ডের জিনিস ১১০ পাউন্ডে বিক্রয় করল। এখন এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তাকে আবার জিনিস কিনতে হবে। তখন তার বিক্রেতা হবে তৃতীয় একজন ব্যক্তি। বিক্রেতা মাত্রকেই যদি লাভ রাখতে হয় তা হলে তৃতীয় ব্যক্তি ১০ পাউন্ড লাভ রেখে ১০০ পাউন্ডের জিনিস ক এর কাছে বিক্রি করবে ১১০ পাউন্ডে। সুতরাং বিক্রেতা হিসাবে ক যেমন ১০ পাউন্ড লাভ করেছিল, ক্রেতা হিসাবে তেমনি তাকে ১০ পাউন্ড খোয়াতে হলো।

ঠিক একই ফলাফল হয়, যদি আমরা উল্টোভাবে দেখি। ক্রেতা হয়ত কমদরে জিনিস কেনে; এই জায়গায় বিক্রেতার হয় লোকসান। আবার অন্য সময়ে এই ক্রেতা যখন বিক্রেতা হয়ে জিনিস বিক্রি করে, তখন সেও লোকসান দেবে। এইভাবে লাভ লোকসানের অঙ্ক কষতে গেলে আমরা দেখতে পাই সব কিছুই আগের মতোই রয়ে গেল, কারো লাভ লোকসান কিছুই হলো না। এর কারণ

প্রত্যেককেই ক্রেতা ও বিক্রেতা দুয়েরই স্থান নিতে হয়। এমন যদি হতো যে একদল শুধু বিক্রয়ই করে, তারা কখনো ক্রয় করে না, তবে শুধু বিনিময় হতে মুনাফা উৎপত্তি ও সৃষ্টির ব্যাখ্যা চলতে পারতো।

এই আলোচনা ও বিচার হতে যে সম্পাদ্যটি আমাদের সামনে উপস্থিত হলো তা এরূপ। সমান-সমান মূল্যের বিনিময় হতে উদ্বৃত্ত মূল্য জন্মাতে পারে না, অথচ অসমান মূল্যের বিনিময়েও তা সম্ভব নয়। উদ্বৃত্ত মূল্য একটি যথার্থ এবং সত্য ঘটনা; বিনিময়ে যদি এর উৎপত্তি না হয় তবে নিশ্চয়ই অন্যত্র এর উদ্ভব হয়েছে।

ব্যবসায়ী পুঁজির যুগে অবশ্য কতক ব্যবসায়ীর হাতে মুনাফা থেকে পুঁজির সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রেণী সমাজের একটি বিশেষ অবস্থায় অল্প দরে জিনিস কিনে বেশি দরে বিক্রি করেছে। এভাবে উভয় দিক থেকে মুনাফা আদায় করে তাদের সঞ্চয়ের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তা থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি মোটেই হলো না, সামাজিক বিত্তের মোটেই পরিপুষ্টি হলো না; অন্যের হাতে যে মূল্য ছিলো তা ছলে বলে মাত্র ব্যবসায়ীর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।

পণ্য চলাচলের জগতে অর্থাৎ বাজারে তাহলে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না; দৃশ্যত যা প্রতীয়মান হয় তার পশ্চাতে মূল্যরূপ সত্যটার সন্ধান নিতে হবে।

পণ্য চলাচলের বাইরে হয় উৎপাদন। এখানেও আমাদের সামনে একটা সমস্যা এসে জুটেছে। চামড়া থেকে বুট তৈরি করতে গেলে মুচির দাম তাতে যুক্ত হলো; তেমন চামড়ারও মূল্যবৃদ্ধি হলো। সুতরাং চামড়া থেকে বুটের মূল্য বেশি। কিন্তু চামড়ার মূল্য রইল ঠিক আগের মতো। বুট তৈরি থেকে মুচির উদ্বৃত্ত মূল্য কিছু সৃষ্টি হলো না; যতোখানি শ্রম সে চামড়ায় আরোপ করেছে, ততখানি মূল্য শুধু চামড়ার মূল্যের সাথে যুক্ত হয়েছে।

মুচিকে যদি উদ্বৃত্ত মূল্য পেতে হয়, তাহলে উৎপাদনের বাইরে বিনিময়ের জগতে একটা বিশেষ রকমের পণ্যের মালিকের সাথে বিনিময়-সম্বন্ধ স্থাপন না করে কোনোভাবেই সে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি ও সংগ্রহ করতে পারে না। সুতরাং এই সূত্রটিতে আমরা এসে পৌঁছলাম– শুধু বিনিময়ের ভেতর যেমন উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি শুধু উৎপাদনেও এর উদ্ভব সম্ভব নয়। এই সমস্যাটা উৎঘাটন করতে হবে।

মুদ্রা পুঁজিতে পরিণত হতে গেলেই তাকে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি করতে হবে; কিন্তু মুদ্রা হিসাবে মুদ্রার ভেতরে এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেননা মুদ্রা পণ্য খরিদ করতে গিয়ে যে মূল্য আনয়ন করে তা এই মুদ্রার ভেতরেই রয়েছে। (ম-প)-র ভেতর যেমন মূল্যের বৃদ্ধি সম্ভব হলো না, (প-ম) এর ভেতরেও তা সম্ভব নয়; কেননা এ সবগুলোতে মূল্য মাত্র রূপান্তরিত হলো। সুতরাং পরিবর্তন ঘটতে হবে যে পণ্যটা প্রথম বিনিময়ের ভেতর খরিদ করা হয়েছে তাতে। পণ্যটির বিনিময় মূল্যের দিক থেকে কোন পরিবর্তন হয় না; কেননা বিনিময় হয়েছে সমান সমান মূল্যের ভেতর। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, পরিবর্তন ঘটবে পণ্যের ব্যবহার মূল্যে অর্থাৎ একে ব্যবহার করার ভেতর। মূল্য সৃষ্টি হয় শ্রম দ্বারা, সুতরাং পুঁজিপতিকে এমন একটা পণ্যের সাক্ষাৎ লাভ করা চাই, যার ব্যবহার ও প্রয়োগ অর্থই হলো উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন। এই বিশেষ পণ্যটিই হলো শ্রম-শক্তি, শ্রম করার ক্ষমতা।

শ্রমিক তার মানসিক ও কায়িক ক্ষমতা ব্যবহার মূল্য প্রস্তুত করতে প্রয়োগ করে থাকে, এই ক্ষমতাকেই বলতে হবে শ্রমশক্তি। বাজারে শ্রমশক্তিকে পণ্য হিসাবে পাওয়ার আগে প্রথমত কতোগুলো সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হওয়া চাই। শ্রমশক্তি পণ্য হিসাবে বাজারে আসতে পারে তখনই যখন এর মালিক অর্থাৎ শ্রমিক শ্রম-শক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কেউ যদি কোন জিনিস বিক্রি করতে চায় তবে সেই জিনিসের উপর চাই তার স্বত্ত্বাধিকার। শ্রম-শক্তির পূর্ণ মালিক হতে হলে আপন দেহের উপর শ্রমিকের পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। শ্রম-শক্তির মালিক এবং মুদ্রার মালিক-আইনের সামনে দুয়েরই সমান অধিকার। প্রভেদ এটুকু যে একজন বিক্রেতা, অন্যজন ক্রেতা। শ্রম-শক্তির মালিক তার পণ্য বিক্রি করবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য—যদি তা না করে সারা জীবনের জন্য সে শ্রম-শক্তি বিক্রি করে তবে আজীবন তাকে কেনা হয়েই থাকতে হয়। ফলে স্বাধীন শ্রমিক না থেকে তাকে সারা জীবনের মতো দাসত্বের বন্ধনকে স্বীকার করে নিতে হয়। পণ্যের মালিক না হয়ে তখন গোটা মানুষটাকেই পণ্য হিসেবে বিক্রিত হতে হবে। শ্রমিক সব সময়ই তার ব্যক্তিগত শ্রম-শক্তির উপর তার দৃষ্টি রাখবে, এটা তার আপন জিনিস। শ্রম-শক্তির উপর তার স্বত্ত্বাধিকার রক্ষিত হতে পারে, যদি ক্রেতাকে সে তার পণ্য সাময়িকভাবে দেয়।

শ্রমিক যদি তার আপন শ্রমশক্তির প্রয়োগ করে পণ্যোৎপাদন করে ও তা বাজারে বিক্রি করে, তা হলে নিশ্চয়ই সে আপন শ্রমশক্তি বিক্রি করার প্রয়োজন বোধ করবে না। সুতরাং এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে হবে, যেন শ্রমিকের পণ্য উৎপাদনের কোনো সুযোগই না থাকে। শ্রম-শক্তি বিক্রি না করে যদি অন্য কোন পণ্য সে বিক্রি করতে চায়, তা হলে তার পক্ষে প্রয়োজন এর উৎপাদন-যন্ত্রের উপর অধিকার। তাছাড়া এই মুহূর্তেই তার চাই জীবন ধারনোপযোগী উপযুক্ত আচ্ছাদনের যোগাড়।

মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করার জন্য পুঁজিপতির পক্ষে বাজারে স্বাধীন শ্রমিকের সাক্ষাত পাওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকের মুক্তি হওয়া চাই দুই রকমে। প্রথমত, নিজের শ্রম-শক্তিকে পণ্যরূপে বিক্রি করতে কোনো অন্তরায় তার থাকবে না। দাসত্ব থেকে তার মুক্তি চাই। দ্বিতীয়ত, শ্রম-শক্তি প্রয়োগের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রয়োজন, তাদের সকল রকমের স্বত্ব থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে। শ্রমিকের শ্রম-শক্তি বাজারে পণ্য হিসাবে আসতে হলে দাসত্ব এবং পণ্যোৎপাদনের উপকরণ, দুই হতেই চাই তার সম্পূর্ণ মুক্তি।

দাসত্ব-মুক্ত এই স্বাধীন শ্রমিকের জাত কি করে সৃষ্টি হলো তার কারণ মুদ্রার মালিক কখনো খুঁজে দেখতে যাবে না। আমরাও এখানে কারণটি অনুসন্ধানে গেলাম না। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখা ভাল, মালিক ও শ্রমিকের ভেতর প্রভেদ কখনো নৈসর্গিক নয়। কতগুলো লোক হবে পুঁজির মালিক, আর কতগুলো লোক হবে শ্রম-শক্তিরূপ পণ্যের অধিকারী—এর কোনো প্রাকৃতিক ভিত্তি নেই; এই সম্বন্ধের মূল কারণ সামাজিক। ঐতিহাসিক পরিণতি ও বিকাশ থেকেই এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছে। এটা পূর্বকার বহু অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্ববর্তী সামাজিক উৎপাদনের রীতির অবসান থেকে এর উদ্ভব।

দ্রব্য যাতে পণ্যে পরিণত হতে পারে, তার জন্য চাই বিশেষ একটা ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। উৎপাদন-কর্তার নিজের জীবন ধারণের উপকরণের জন্যেই যদি উৎপাদন

হয়, তাহলে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে আনীত হতে পারে না; সমাজ প্রগতির একটা বিশেষ স্তরে এই অবস্থাটার অবসান হয়ে বিনিময় প্রথার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, বাজারে পণ্য ও মুদ্রার প্রচলন থেকেই পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্টি হয় না। পুঁজিতন্ত্র তখনই আসতে পারে, যখন নাকি যন্ত্রপাতি ও সকল রকম গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণের মালিক পুঁজিপতি বাজারে শ্রম-শক্তিরূপ পণ্যের বিক্রয়কারী শ্রমিকের সম্মুখীন হবে।

সমাজ-উৎপাদনে পুঁজি একটা নতুন অধ্যায় সূচিত করেছে।

এখন আমরা শ্রম-শক্তি পণ্যটার বিশ্লেষণ করব। শ্রমশক্তি যখন পণ্য, তখন অন্যান্য পণ্যের মতোই তারও মূল্য রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠবে, এর মূল্য নির্ধারিত হবে কিভাবে? অন্যান্য পণ্যের যেমন মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রম দ্বারা, তেমনি শ্রম-শক্তিরও মূল্য নির্ধারিত হবে এর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের জন্যে কতখানি শ্রম-সময় ব্যয় হবে, তা দিয়ে। শ্রম-শক্তির অস্তিত্ব শ্রমের সামর্থ হিসেবেই। শ্রমের সামর্থ যেন মানুষ না হারাতে পারে তার জন্যে শ্রমিককে বেঁচে থাকতে হবে। তার জীবন ধারণ ও ভরণপোষণের জন্যে আবশ্যক হয় একটা বিশেষ পরিমাণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী উপকরণ। বস্তুত এই উপকরণের মূল্যই হলো শ্রম-শক্তির মূল্য। শ্রমিকের সামর্থ যতক্ষণ প্রয়োগ না হয়, ততক্ষণ নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। এটি যথার্থ হয় প্রয়োগ দ্বারা। শ্রম-শক্তির প্রয়োগ মানে শারীরিক খাটুনি, দৈহিক ক্ষয়। শ্রমিক আগামীকাল যখন পুনরায় কাজে প্রবৃত্ত হবে তখন যেন পূর্বদিনের সুস্থতা ও স্বাভাবিক সামর্থ নিয়েই কাজ করতে পারে, তা দেখতে হবে। শ্রম করলেও শ্রমিক যেন স্বাভাবিক মানুষ থেকেই প্রতিদিন বাঁচতে পার তার জন্যে প্রয়োজন প্রতিদিনের ক্ষয়কে পূরণ করে নেয়ার মতো উপযুক্ত উপভোগের উপকরণ। এই উপকরণের মাত্রা এক এক দেশে একেক রকম। তা কতোকটা নির্ভর করে জলবায়ুর উপর; শীতপ্রধান দেশে এমন কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয় যা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে হয় না। যা হোক, সামাজিক কারণে এই মাত্রার তারতম্য হয় অনেকখানি। ইংল্যাণ্ডের লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা ভারতীয়দের থেকে বেশি। সুতরাং শ্রম-শক্তির মূল্যও সেখানে অধিক। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে শ্রমিকসংঘগুলো প্রবল হওয়ায় মালিক শ্রমিকের মজুরি ইচ্ছেমতো কমাতে পারে না। দেশভেদে স্বাচ্ছন্দ্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কোনো একটি বিশেষ দেশে এই মাত্রার গড়পড়তা পরিমাণ আমরা বুঝতে পারি।

পুঁজির লক্ষ্য হবে, বাজারে শ্রমিকের যোগান যেন স্থায়ী হয় তা দেখা। যদি কোনো সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম-শক্তির অভাব ঘটে তা হলে পুঁজির প্রসার সম্ভব হয় না। তাই শ্রমিকের সন্তান সন্ততিরা যেন তার অভাবে অথবা মৃত্যুর পরে তার জায়গা নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে শ্রমশক্তি বাজার থেকে সরে পড়ছে তার জায়গা পূর্ণ করবে নতুন শ্রম-শক্তি। সুতরাং এই গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণ যে শুধুই এখনকার শ্রমিককে ভরণপোষণ যোগাবে তা নয়, ভবিষ্যতের শ্রমিক অর্থাৎ বর্তমান শ্রমিকদের সন্তান সন্ততিদেরও খোরাকের জন্য তা যথেষ্ট হওয়া চাই।

আমরা দেখলাম শ্রম-শক্তির মূল্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ভরণপোষণোপযোগী উপকরণ ছাড়া আর কিছু না। এই উপকরণের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-শক্তির মূল্যেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হবে।

এই বিশিষ্ট পণ্যটার একটা বিশেষত্ব হলো এই যে, শ্রমিকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথেই পুঁজিপতি এর ব্যবহার মূল্য হাতে পায়নি। শ্রম-শক্তির মূল্য অন্যান্য পণ্যের মতোই আগে থেকেই অর্থাৎ বিনিময়ে যাবার পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু এর ব্যবহার মূল্য স্থির হয় যখন পুঁজিপতি পরবর্তী সময়ে কারখানায় একে প্রয়োগ করে। শ্রম-শক্তির বিক্রি এবং ক্রেতা কর্তৃক এর প্রয়োগ—এই সময়টার ভেতরে একটা ব্যবধান রয়েছে। একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শ্রমিক শ্রমশক্তি বিক্রি করল বটে, কিন্তু তখনও সে তার মূল্য পায়নি। শ্রমিককে খাটিয়ে অর্থাৎ তার শ্রম-শক্তিকে কার্যকরী করে তবে পুঁজিপতি মূল্য দিয়ে থাকে। শ্রমিক মূল্য না নিয়েই গতর খাটাতে রাজী হল। শ্রম শক্তির ব্যবহার মূল্য পুঁজিপতি অগ্রিম পেল।এটি যে খুবই সত্যি তা একটা প্রমাণ দেখালেই পরিষ্কার হবে—পুঁজিপতি যদি কখনো দেউলিয়া হয়, কারবার গোটাতে বাধ্য হয়, শ্রমিকেরা মজুরি থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। বিনিময়ের সময় শ্রম-শক্তির দামই মাত্র ঠিক হয়, কিন্তু শ্রমিককে তা বাড়ী ভাড়া দেয়ার মতো নির্দিষ্ট দিন পরপর আদায় করে নিতে হয়। অবশ্য আমাদের আলোচনায় আমরা ধরে নেব যে মজুর বিনিময়ের সময়ই তার মজুরি পায়।

এখন আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছি, পণ্যের ক্রেতা যে দাম শ্রমিককে দেয় তা কিভাবে নিরূপিত হয়। যে ব্যবহার মূল্য ক্রেতা পেয়ে থাকে, তা শ্রম-শক্তির প্রয়োগ কিংবা ব্যবহার থেকেই সঞ্জাত হয়। শ্রম-শক্তিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে মুদ্রার মালিক কাচামাল প্রভৃতি যা যা প্রয়োজন বাজারে পূর্ণ মূল্য দিয়ে সে সব ক্রয় করে থাকে। শ্রম-শক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ অর্থই হলো নতুন পণ্য উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি।

বাজারের ব্যাপার আমরা দেখেছি। সেখানে সব কিছুই প্রকাশ্যভাবে সবার দৃষ্টির সামনেই ঘটে থাকে। এখন এই প্রকাশ্য স্থান থেকে বিদায় নিয়ে যদি আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে যে উৎপাদনের স্থান রয়েছে, সেখানে যেতে চেষ্টা করি, তবে দেখব এর প্রবেশ-দ্বারে লেখা রয়েছে-'প্রবেশ নিষেধ'। এখানেই আমরা দেখতে পাব শ্রমিককে খাটিয়ে কেমনভাবে পুঁজি শোষণের সাহায্যে নিজের আয়তন বৃদ্ধি করে। এই স্থানেই মুনাফা সৃষ্টির গুপ্ত কৌশলটি আমরা আবিষ্কার করব।

বাজারে শ্রমিক ও পুঁজিপতি দু'জনই স্বাধীন। এরা পৃথক পৃথক পণ্যের মালিক। বাজারে এরা মালিক হিসেবে পরস্পর সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়-কিন্তু শ্রম-শক্তি কেনা হয়ে গেলেই পুঁজিপতি সগর্বে কারখানা অভিমুখে ছুটে যায়; শ্রমিক তার পেছনে পেছনে চলে। পুঁজিপতি দ্রুত পায়ে চলে, শ্রমিক এক পা এগোলে দু'পা পিছনে সরতে চায়। কারো যদি এমন বুদ্ধি হয় যে নিজের শরীরের চামড়া খুলে তা বাজারে বিক্রি করে উপযুক্ত মূল্য আনবে, তা হলে অনিবার্য মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু কি সে প্রত্যাশা করতে পারে? শ্রমিকের ভাগ্যেও যে তা-ই আসন্ন তা বুঝতে তার বাকী থাকে না।

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন

পুঁজিপতি শ্রম-শক্তি কেনে তা ব্যবহার করার জন্য। শ্রম–শক্তির ব্যবহার অথবা প্রয়োগকে বলতে পারি শ্রম। পুঁজিপতি শ্রমিককে দিয়ে তৈরি করায় বিশিষ্ট প্রকারের ব্যবহার মূল্য। শ্রমিককে অবশ্য পুঁজিপতিই নিযুক্ত করে; তাকে খাটতে হয় পুঁজিপতির মুনাফা সৃষ্টির জন্যই। এই উৎপাদন ব্যবস্থা এখনকার সময়ে অন্যযুগের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পৃথক হলেও, শ্রম প্রক্রিয়াটি সর্বত্র ও সব সময়েই একই রকম। এই শ্রম প্রক্রিয়াটা সম্পর্কেই এখন আমরা আলোচনা করব।

শ্রমের ভিতরে মানুষ এবং প্রকৃতি দুয়েরই অংশ রয়েছে। প্রকৃতির উপর মানুষ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রিয়া করে। মানুষ প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত একটা জীববিশেষ, অথচ আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে ও মস্তিষ্কের শক্তি খাটিয়ে প্রকৃতিকে জয় করে নেয়ার জন্যে তার সাথে বিরোধীতার সম্পর্কে দাঁড়ায়। এভাবে ক্রিয়া করে নিয়ত সে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করছে, তার চেহারা বদলে দিচ্ছে; শুধু তাই না, এই দ্রব্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে সে তার নিজের প্রকৃতিও পরিবর্তন করছে। সক্রিয় মানুষ তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিগুলোকে সজাগ করে তুলছে এবং ক্রমেই এই শক্তিগুলোকে আয়ত্তে এনে সচেতনভাবে পরিচালনা করছে। আমরা এখানে আদিম যুগের শ্রম ব্যবস্থার সহজ রূপ সম্পর্কে আলোচনা করব না; তা এতো সহজ সরল যে আমাদের পশুদের উৎপাদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিম যুগের এই শ্রমের রূপ এবং এখনকার যুগের শ্রম-শক্তির প্রয়োগ, এই দুয়ের ভেতর ব্যবধান রয়েছে। আমরা এখানে শুধু মানুষের শ্রমের কথাই বলব। ঊর্ণনাভের তৈরি জাল তন্তুবায়ের তৈরি জালের সদৃশ্য। মৌমাছির তৈরি চাক বড় বড় শিল্পীদেরও লজ্জা দেয়।

কিন্তু তা হলেও নিকৃষ্টতম শিল্পী এবং সর্বোৎকৃষ্ট মৌমাছিতে প্রভেদ এখানে যে, শিল্পী কাজ শুরু করার আগেই যে জিনিস তৈরি করতে সে প্রস্তুত হয় সে সম্পর্কে মাথা খাটায় এবং পূর্বে থেকেই একটা ধারণা করতে চেষ্টা করে। যে কোনো শ্রম-প্রক্রিয়ার উপসংহারে আমরা যে ফলাফলটা পাই তা কল্পনায় আগে থেকেই শ্রমকারীর মস্তিষ্কে থাকে। উৎপাদন দ্বারা শুধু প্রকৃতিকেই যে সে পরিবর্তন করছে তা নয়, যে উদ্দেশ্য সে সিদ্ধ করতে যাচ্ছে তা তার শ্রমকেও নিয়ন্ত্রিত করে এবং সুপরিচালিত করে; যথেচ্ছভাবে সে শ্রম করতে পারে না।

শ্রম-প্রক্রিয়ার প্রাথমিক উৎপাদনগুলো নিম্নোক্তরূপে– (১) শ্রমের বিষয়, (২) শ্রম করার যন্ত্রপাতি।

যে সব বস্তুকে মানুষ মাত্র প্রকৃতি থেকে উঠিয়ে নেয় তাদের বলা যেতে পারে শ্রমের বিষয় (object)। এগুলো প্রকৃতি থেকে মানুষ সংগ্রহ করে নিতান্তই অনায়াস সাধ্যভাবে—যেমন জলের মাছ, জঙ্গলের কাঠ। কিন্তু এই ধরনের শ্রমের বিষয় যদি আগে শ্রমের ভিতর দিয়ে একটি স্তর অতিক্রম করে আসে, তবে তাকে বলব কাঁচামাল। যেমন মদ তৈরি করতে চালের প্রয়োজন। চাল মদের কাঁচামাল, কেননা

চালকে পাওয়া গেছে আগের শ্রমের ফলস্বরূপ, জঙ্গলের কাঠের মতো তা কুড়িয়ে পাওয়া যায়নি। সব কাঁচামালই শ্রমের বিষয়, কিন্তু সব শ্রমের বিষয়ই কাঁচামাল নয়। তবে কাঁচামাল হতে পারে, যদি মাত্র একটি শ্রম-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তা যায়।

উৎপাদনের যন্ত্রপাতি শ্রমিকের শ্রম এবং শ্রমের বিষয়ের ভেতরে মধ্যস্থতা করে। কতোগুলো বস্তুর যান্ত্রিক, ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্মকে সে প্রয়োগ করে অন্য কতোগুলো বস্তুকে আয়ত্ত করার জন্য। অনেক জিনিসই আমরা শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা করেই পেতে পারি, যেমন গাছ থেকে ফল আহরণ; এই জাতীয় খাদ্য আহরণের কথা বাদ দিলে আমরা দেখতে পাই যে মানুষ প্রথম হাত করে শ্রমের বিষয়কে নয়, উৎপাদনের যন্ত্রপাতিকে। এই যন্ত্রপাতি আমরা প্রকৃতি থেকে পাই; এভাবে প্রকৃতি মানুষের শ্রমের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ।

বাইবেল যতোই বলুক না কেন যে, মানুষ কখনো তার সাড়ে তিন হাত লম্বার আয়তন বদলাতে পারে না, আমরা প্রত্যক্ষত দেখছি প্রকৃতিকে হাতিয়ার স্বরূপ পেয়ে মানুষ তার স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সম্পূর্ণ করেছে; তার আয়তন এবং সামর্থ্যও বেড়ে গেছে অনেকখানি। প্রকৃতি যেমন প্রথম থেকেই মানুষের মূল আশ্রয়স্থল, তেমনি তার যন্ত্রঘর। শ্রম-প্রণালী সামান্য যখন উন্নত হয়েছে তখন থেকে শ্রমের জন্যে প্রয়োজন হয়েছে বিশেষ রকমের যন্ত্রপাতি। আধুনিক কালের গবেষণায় আদিম যুগের গুহা-গহ্বরে প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে। হাতিয়ার তৈরি এবং তার প্রয়োগ যদিবা কোন কোন পশুর ভেতরে আমরা ক্ষুদ্র আকারে দেখে থাকি, তথাপি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে তার প্রয়োগ করা প্রধানত মানুষেরই বিশেষত্ব। যে সব জীবজন্তু বিবর্তনের পথে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের সম্বন্ধে জানার জন্যে যেমন গুহা-গহ্বর থেকে অস্থি সংগ্রহের প্রয়োজন হয়, তেমন আদিম সমাজ সম্পর্কে সম্যক জানার জন্য প্রয়োজন হয় আদিম লোকদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির চিহ্নবিশেষের আবিষ্কার। বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগগুলোর বিশেষত্ব ও প্রভেদ জানতে হলে বিশেষ করে জানা প্রয়োজন কেমন যন্ত্রপাতি দিয়ে বিভিন্ন যুগের লোকেরা ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি করত। কি কি দ্রব্য তারা ব্যবহার করত তার তালিকা থেকে আমরা বিশেষ কিছুই জানতে পারি না। যন্ত্রপাতির আবিষ্কার থেকে শুধু যে আমরা শ্রম করার প্রণালী কতটা উন্নত হয়েছে তা জানতে পারি এমন নয়, যন্ত্রপাতির স্বরূপ দেখে বলা যেতে পারে, কি ধরনের সমাজব্যবস্থার ভেতরে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ হয়।

উৎপাদনের যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতির বিষয়ের উপর কাজ করার অর্থ হলো এই যে মানুষ একটা পরিকল্পনা অনুসারে বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। শ্রম-প্রক্রিয়া নিঃশেষিত হয় শ্রমের ফলাফলের অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যেরই ভেতরে। এইখানে শ্রম শ্রমের বিষয়ের সাথে একীভূত হয়ে যায়; শ্রম বাস্তব রূপ নেয়। শ্রমের বিষয় অপর একটা দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়।

এখন সমস্ত বিষয়টা যদি আমরা উৎপাদিত ফলাফলের দিক থেকে পরীক্ষা করি, তবে দেখব শ্রমের যন্ত্রপাতি এবং শ্রমের বিষয় দুই-ই উৎপাদনের উপকরণ মাত্র; স্বয়ং শ্রম হলো উৎপাদনকারী শ্রম।

শ্রম-প্রক্রিয়া ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি; ব্যবহার মূল্য প্রস্তুত করার জন্য এটা প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রিয়া। মানুষ এবং প্রকৃতির ভেতর আদান-

প্রদানের জন্য এই ক্রিয়া অপরিহার্য। মানুষকে বাঁচতে হলে শ্রম অবশ্য কর্তব্য, এটি একটি প্রাকৃতিক বিধি। যেমন সমাজব্যবস্থাই হোক না কেন, মানুষকে শ্রম করতেই হবে; কেন না, শ্রম মানুষের শরীরের ধর্ম। এই বিচারে আমরা একদিকে মানুষ ও মানুষের শ্রম এবং অন্যদিকে প্রকৃতি ও প্রকৃতির বস্তু, এই দুটিকে পরস্পর সম্মুখীন করে দেখেছি। বার্লির স্বাদ যেমন বলে দিতে পারে না কে বার্লি তৈরি করেছে, ঠিক তেমন শ্রম প্রক্রিয়াও আপনা থেকে কখনো বলে দিতে পারে না, কিরূপ ব্যবস্থায় শ্রম প্রয়োগ করা হয়েছে– দাস প্রথায় অথবা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায়।

পুঁজিপতিকে আমরা বাজারে ছেড়ে এসেছিলাম। সেখানে সে শ্রম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্যে যাবতীয় দ্রব্য ক্রয় করেছে। এখন সে শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনের উপকরণাদির সাথে এর সংযোগ করে দেবে।

এরূপ ব্যবস্থায় যে সব দ্রব্য প্রস্তুত হবে, তার উপর শ্রমিকের কোন দাবী দাওয়া থাকবে না। এগুলোর মালিকানা সম্পূর্ণ পূজিপতির। সুতরাং, পুঁজিপতি খুবই লক্ষ্য রাখবে যেন তার দেওয়া উৎপাদনের উপকরণগুলো শ্রমিক ঠিকমতো ও যত্নের সাথে প্রয়োগ করে। উৎপাদনের জন্য এগুলোর যেটুকু ব্যয় প্রয়োজন, তার বেশি অযথা অপচয় পুঁজিপতির স্বার্থের প্রতিকুল।

পুঁজিপতি যে উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করে তা ব্যবহার মূল্য। তবে এই ব্যবহার মূল্য সে নিজে ব্যবহার করে না, বিনিময় মূল্যের মূল বলেই ব্যবহার মূল্য উৎপাদন করা হয়েছে। পুঁজিপতির লক্ষ্য দুটি (১) সে ব্যবহার মূল্য তৈরি করবে বিনিময়ের জন্যে অর্থাৎ তার দ্রব্যকে সে পণ্যে পরিণত করবে, (২) সে এমন পণ্য প্রস্তুত করবে যার মূল্য যে সব উপকরণ দিয়ে পণ্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের সমষ্টিগত মূল্য থেকে বেশি। পুঁজিপতির উদ্দেশ্য খালি ব্যবহার মূল্য তৈরি করাই নয়, সেই ব্যবহার মূল্যকে পণ্যে পরিণত করার জন্যেই দ্রব্যোৎপাদন; অর্থাৎ ব্যবহার মূল্যই শুধু নয়, মূল্য সৃষ্টি করাই তার উদ্দেশ্য। আরো তলিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যাবে যে, মূল্য সৃষ্টিই তার একমাত্র উদ্দেশ্য না, পুঁজিপতির মূল লক্ষ্য হলো উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি। আমরা দেখলাম, পণ্যগুলো একই সময়ে ব্যবহার মূল্য ও মূল্য; শ্রম প্রক্রিয়ায়ও একই সময়ে পণ্যোৎপাদনও হয় এবং মূল্য সৃষ্টিও হয়।

আমরা জানি যে যতোখানি শ্রম সমাজ নির্ধারিত পরিমাপের অনুপাতে একটা পণ্যে দেওয়া হয়েছে তা দিয়েই পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। ১০ পাউন্ড সুতা তৈরির জন্যে প্রথম প্রয়োজন হয়েছে কাঁচামাল। এক্ষেত্রে ধরা যাক ১০ পাউন্ড তুলা এই কাঁচামাল। পুঁজিপতি ১০ শিলিং খরচ করে এই তুলা কিনেছে; এই ১০ শিলিংকে ধরা যেতে পারে তুলার মূল্য। টাকু প্রভৃতি যন্ত্রপাতির জন্য পুঁজিপতিকে খরচ করতে হয়েছে ২ শিলিং। এখন যদি ১০ শিলিং ও ২ শিলিং-এই ১২ শিলিং-এ মোট ২৪ ঘণ্টার শ্রম অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা করে ২ দিনের শ্রম থেকে থাকে তা হলে সূতার ভেতর দুই দিনের শ্রম এবং সে অনুযায়ী মূল্য আগে থেকেই থাকবে। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে, ১০ পাউন্ড সুতা তৈরিতেই সবটুকু টাকু খরচ হয়ে যায় নি, টাকুর সম্পূর্ণ মূল্যের যে অংশটুকু সুতার ভেতর ঢুকেছে, তা মাত্র ২ শিলিং এর।

এখন দেখতে হবে সুতার মোট মূল্যের কত অংশ তন্তুবায় তার শ্রম দিয়ে তুলায় সংযোগ করেছে। তন্তুবায় ৬ ঘণ্টা কাজ করলেই ১০ পাউন্ড তুলাকে ১০ পাউন্ড সুতায় পরিবর্তিত করতে পারে। তা হলে অতীত শ্রম ও নতুন শ্রম মিলে সুতার ভেতর সবশুদ্ধ শ্রম রয়েছে আড়াই দিনের, অথবা ১৫ শিলিং পরিমাণের মূল্য।

এই ফলাফল থেকে দেখা গেল যে, যে ১৫ শিলিং পুঁজিপতি প্রথম বাজারে খাটিয়েছিল, ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যই সে ফিরে পেয়েছে। মূল্যের প্রসার হলো না, মূল্যবৃদ্ধি হলো না, উদ্বৃত্তমূল্য জাত হলো না। সুতরাং মুদ্রা রূপান্তরিত হয়ে পুঁজির রূপ ধারণ করতে পারল না। ১৫ শিলিং এর ১০ শিলিং তুলায়, ২ শিলিং যন্ত্রপাতিতে আর ৩ শিলিং শ্রম-শক্তির জন্যে দেয়া হয়েছে। এই সবগুলোকে মিলিয়ে ১৫ শিলিংই হলো বটে, কিন্তু তা হতে পুঁজিপতির জন্য মোটেই কোন লাভ জন্মাল না।

পুঁজিপতি একদিনের জন্যে শ্রমশক্তি কিনেছে; এর একদিনের মূল্য ৩ শিলিং। এই ৩ শিলিং এর মূল্য শ্রমিককে ৬ ঘণ্টা খাটিয়ে সে তুলে নেয়। এখন সে হিসেব করে একদিনের জন্যে যখন শ্রমশক্তি কিনেছি এবং একদিনের জীবনধারণোপযোগী ৩ শিলিং যখন তাকে দেয়াই হলো, তখন আরো ৬ ঘণ্টা অর্থাৎ মোট ১২ ঘণ্টা তাকে খাটাতে আপত্তি কি? তাই দেখা গেল, শ্রমশক্তির জন্য ৩ শিলিং এবং ১২ ঘণ্টা খাটিয়ে একদিনে শ্রমিক যে মূল্য উৎপাদন করে, অর্থাৎ ৬ শিলিং—দুটো ভিন্ন পরিমাণের। পুঁজিপতি বাজারে শ্রমশক্তি কেনার সময়ই এই প্রভেদটির উপর লক্ষ্য রাখে; কেননা, শ্রম-শক্তির মূল্য এবং শ্রম-শক্তির প্রয়োগ থেকে যে মূল্য উৎপাদিত হয় তার প্রভেদ থেকেই পুঁজিপতির মুনাফার সৃষ্টি। শ্রম-শক্তির প্রয়োগ দিয়ে ব্যবহার মূল্য প্রস্তুত করাই কখনো পুঁজিপতির লক্ষ্য হতে পারে না। শ্রমশক্তির একটা বিশেষ ধর্মের উপরেই তার দৃষ্টি—শ্রমশক্তি খালি মূল্যের উৎস নয়, নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য সৃষ্টির জন্য এটাই মূল। এই বেশি মূল্য প্রত্যাশায় পুঁজিপতি শ্রমিকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সমান মূল্যের ভিতরেই বিনিময় হতে হবে, এই বাজার বিধি মেনে চলতে পুঁজিপতি মোটেই কুণ্ঠিত নয়। যার যতোখানি মূল্য, পুঁজিপতি তা পুরোপুরিই দিয়েছে, শ্রমিককেও দেওয়া হয়েছে তার শ্রম-শক্তির মূল্য, বেঁচে থাকার জন্য যতখানি আবশ্যক তা সে পেয়েছে।

তা হলে দেখা গেল, শ্রমিককে শ্রম-শক্তির মূল্য উৎপাদনের জন্যে যতো শক্তির প্রয়োজন অর্থাৎ মাত্র ৬ ঘণ্টা না খেটে আরো বেশি খাটানো সম্ভব। যদি আরো ৬ ঘণ্টা খাটুনি বাড়িয়ে দেয়া যায় অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা খাটানো যায়, তা হলে আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোর পরিমাণও সে অনুপাতে অর্থাৎ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। এই আনুষঙ্গিক উপকরণের মূল্য এখন ১২ শিলিং না হয়ে ২৪ শিলিং হবে। ৬ ঘণ্টা খেটে আরো ৩ শিলিং এর মূল্য তাতে যুক্ত করা হলো; এটি শ্রম শক্তির মূল্যের সমান। এর পরও ৬ ঘণ্টা বেশি খাটিয়ে আরো ৩ শিলিং-এর মূল্য উৎপাদন করা হলো। মোট মূল্য উৎপাদন হলো ৩০ শিলিং এর। কিন্তু এই ৩০ শিলিং এর ২৭ শিলিং এর উপর তার কোনো হাত নেই। কেননা, বাজারে শ্রম-শক্তি এবং অন্যান্য উপকরণাদি কিনতে সে যা ব্যয় করেছে, তা এই ২৭ শিলিং এর সমান। বাকী ৩ শিলিং তার মুনাফা, পুঁজিপতির লভ্যাংশ অথবা উদ্বৃত্ত মূল্য।

সব দিকই রক্ষা হলো। বাজারে বিনিময়ের বিধিও মেনে চলা হলো, সবাইকেই তার মূল্য অনুরূপ যা প্রাপ্য তা দেয়া হলো, পুঁজিপতিরও কোনো আফসোস থাকল না, সে তার বিনা আয়াস সাপেক্ষ অতি কাঙ্ক্ষিত উদ্বৃত্ত মূল্য পেল।

উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আমরা শ্রম-প্রক্রিয়া ও মূল্যোৎপাদন প্রক্রিয়া—এই দুয়ের সমন্বয় হিসাবে দেখতে পারি। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আমরা শ্রম-প্রক্রিয়া এবং উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের ঐক্যস্থল হিসেবেই দেখব।

শ্রম-প্রক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ উপকরণগুলো মূল্য সৃষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন ভূমিকা সম্পাদন করে।

শ্রমিক তার শ্রমের বিষয়ের সাথে নতুন শ্রম যোগ করে, এই শ্রমের বিশেষ-রূপ ও উপযোগ যাই হোক না কেন। পক্ষান্তরে উৎপাদনের উপকরণগুলো শ্রম-প্রক্রিয়ায় বিলুপ্ত হলেও তাদের মূল্য নতুন উৎপাদিত দ্রব্যে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এই উপকরণগুলোর মূল্য যে দ্রব্য নতুন উৎপাদিত হলো তার গোটা মূল্যের অংশবিশেষ। তুলা এবং সুতা কাটার যন্ত্র তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব হারালো বটে, কিন্তু নতুন উৎপাদিত দ্রব্য সুতায় তাদের মূল্য সংরক্ষিত হলো। এই দ্রব্যান্তর সংঘটিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ এসব উপকরণগুলোর অন্য দ্রব্যে পরিবর্তনের সময়। এই অবস্থাটা আনয়ন করে শ্রম, কিন্তু কি উপায়ে?এই দ্রব্যান্তর সংঘটিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ এসব উপকরণগুলোর জন্য দ্রব্যে পরিবর্তনের সময় এই অবস্থাটা আনয়ন করে শ্রম, কিন্তু কি উপায়ে?

শ্রমিক একই সময়ে দুটি পৃথক পৃথক কাজ করে না; প্রথম, তুলায় মূল্য সংযোজন; দ্বিতীয়, উৎপাদনের উপকরণগুলোর মূল্য সংরক্ষণ। নতুন মূল্য সংযাজন ক্রিয়া দ্বারাই সে পুরনো মূল্য সংরক্ষণ করে যাচ্ছে। তাহলে দেখা গেল, শ্রমের দুটি প্রকৃতি রয়েছে, একই সময় একটা শ্রম-প্রক্রিয়ার ভেতর মূল্য সংযোজন করতে গিয়ে সে মূল্য সংরক্ষণও করছে।

এখন কথা উঠবে, এই মূল্য সংযোজন হয় কিভাবে? স্পষ্টই দেখা যায়, বিশেষ রূপের শ্রম দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন করেই এটা সম্পন্ন হচ্ছে। তন্তুবায় সুতা কেটে, মুচি জুতা তৈরি করে এই মূল্য সংযোজন কার্যটা সম্ভব করছে। তা হলে দেখা গেল, ব্যবহার মূল্য উৎপাদন করে তবে মূল্য সংযোজন সম্ভব হচ্ছে শ্রমের একটা বিশেষ রূপে-যেমন সুতা কাটায় দেখা যায়। এই নতুন উৎপাদিত দ্রব্যের ভেতর তুলা এবং সুতা কাটার যন্ত্রপাতির অস্তিত্ব বিলোপ হয়েছে বটে, কিন্তু তারাই হলো নতুন দ্রব্য তৈরির উপাদান।

আমরা আগেই জানি, নতুন ব্যবহার মূল্য উৎপাদন করতে যে সব ব্যবহার মূল্যকে উপাদান রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের মূল্য নতুন দ্রব্যের মোট মূল্যেরই অংশ। এদের মাঝে যতো খানি শ্রম রয়েছে, তা-ই দ্রব্যান্তরিত হয়ে নতুন দ্রব্যে আশ্রয় নিয়েছে। এতোকাল তারা নিষ্ক্রিয় হয়েই ছিল, সজীব শ্রমের সংযোজন-এ তারা নতুন শ্রম-প্রক্রিয়ায় নতুন দ্রব্য উৎপাদনে তৎপর ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

তা হলে দেখা গেল শ্রমের বিশেষ রূপ ছাড়াও একটা সাধারণ রূপ আছে বলেই অর্থাৎ শ্রম মানুষের শ্রম শক্তির ব্যয় বলেই, সুতাকাটারূপ বিশেষ শ্রমটা তুলা এবং

সুতাকাটার যন্ত্রপাতিতে নতুন মূল্য সংযোজন করতে পারল। কিন্তু অন্যদিকে এই শ্রমের বিশেষ রূপটার জন্যেই অর্থাৎ মানুষের শ্রম-শক্তির ব্যয় একটা বিশেষ প্রকারে সংঘটিত হয় বলেই, সুতাকাটারূপ শ্রম-শক্তির ব্যয়ে আমরা লক্ষ্য করি যে তা যেমন উৎপাদনের উপকরণগুলোর মূল্য দ্রব্যান্তরিত করছে, তেমনি এই নতুন দ্রব্যের ভেতরে মূল্যও সংরক্ষণ করছে।

ধরা যাক যে, যন্ত্রপাতির নতুন আবিষ্কারের জন্য শ্রমিক আগে ৩৬ ঘন্টায় যে পরিমাণ সুতা কাটত, তা সে এখন ৬ ঘন্টায়ই কাটতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি এখন ছয়গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬ ঘন্টায় আগে সে কাটত ৬ পাউন্ড সুতা, এখন কাটে ৩৬ পাউন্ড। আগে ৬ পাউন্ড সুতায় যে শ্রম দেয়া হতো তা এখন দেয়া হয় ৩৬ পাউন্ডে। ১ ঘন্টার জায়গায় প্রতি পাউন্ডে এখন $\frac{১}{৬}$ ঘন্টা দিলেই চলে। ৬ ঘন্টা সুতা কেটে এখন যে কাঁচামালের মূল্য দ্রব্যান্তর করা হয়, তা আগেরটা থেকে ৬ গুন বেশি। ৬ ঘন্টা সুতা কেটে যে কাঁচামালের মূল্য দ্রব্যান্তর ও সংরক্ষণ করা হলো তা ছয়গুণ বেশি বটে, কিন্তু প্রতি পাউন্ডে কাঁচামালের যে নতুন শ্রম সংযোজন হলো তা আগেরটার $\frac{১}{৬}$ অংশ। কম সময়ে বেশি কাজ হলে মূল্য সংরক্ষণ হয় বেশি, সংযোজন হয় কম।

এই বিচারে আমরা দেখলাম, উৎপাদনের উপকরণগুলো সুতাকাটার কাজে লেগে তাদের আগের ব্যবহার-মূল্যের রূপটাকে হারিয়েছে সত্যি, কিন্তু তাদের মূল্য সংরক্ষিত হয়েছে। এগুলো নতুন একটা দ্রব্য উৎপাদনের কাজে লেগে নতুন ব্যবহার-মূল্যের রূপ নিয়েছে। কিন্তু উৎপাদনের সব উপকরণগুলোর ব্যবহার-মূল্য যেমন একভাবে বিনষ্ট হয় না, তেমনি একই প্রকারে তাদের মূল্যও সংরক্ষিত হয় না। কয়লা যখন জ্বলতে শুরু করে, তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হয়। সব ধরণের কাঁচামালের বেলায়ই এটা ঘটে। কিন্তু যন্ত্রপাতি কখনো একটা শ্রম প্রক্রিয়াতেই বিলুপ্ত হয় না। এদের সবটা মূল্য একটা শ্রম-প্রক্রিয়াতেই দ্রব্যান্তরিত হয়ে সংরক্ষিত হয় না। দিন দিনই যন্ত্রপাতির ক্ষয় হচ্ছে সত্যি, কিন্তু প্রতিদিনই পূর্ব-চেহারা নিয়ে এগুলো কাজে ব্রতী হয়। একটা সুতাকাটার যন্ত্রের আয়ু দশ বছর হলে, স্পষ্টতই আমরা দেখি যে দশ বছরে যতো দ্রব্য প্রস্তুত হয়েছে তাতে এর মূল্য দিনে দিনে দ্রব্যান্তরিত হয়েছে। যন্ত্রপাতির জীবনকে মানুষের জীবনের সাথে তুলনা করা চলতে পারে। প্রতিদিন মানুষ ২৪ ঘন্টা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে ; কিন্তু খালি মুখের চেহারা দেখেই বলা চলে না আর কতোদিনে কার আয়ু নিঃশেষিত হবে। কিন্তু তাই বলে কি বীমা কোম্পানীগুলো মানুষের মৃত্যুর গড়পড়তা তারিখ হিসাব করে মুনাফা করছে না ? শ্রমের যন্ত্রপাতির বেলায়ও এটাই খাটে। অভিজ্ঞতা দিয়ে যন্ত্রপাতির আয়ুর গড়পড়তা হিসাব জানা সম্ভব হয়। ধরা যাক যেন একটা যন্ত্রের ব্যবহার-মূল্য শ্রম-প্রক্রিয়ায় ৬ দিনেই নিঃশেষিত হয়। তা হলে প্রতিদিন বিনষ্ট হয় $\frac{১}{৬}$ অংশ ব্যবহার মূল্য; তদনুযায়ী যে মূল্য দ্রব্যান্তরিত ও সংরক্ষিত হয়, তা-ও $\frac{১}{৬}$ অংশ। লক্ষ্য করতে হবে যে যন্ত্রপাতি তাদের সম্পূর্ণ দেহ নিয়েই প্রতিদিনের শ্রম প্রক্রিয়ার ভেতরে উপস্থিত হয়, অথচ এদের মূল্য দ্রব্যান্তরিত ও সংরক্ষিত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, যন্ত্রপাতি কখনো তাদের ব্যবহার-মূল্যের বিনাশ হওয়ায় যতোখানি মূল্য হারাচ্ছে তার বেশি মূল্য দ্রব্যান্তরিত ও সংরক্ষণ করতে পারে

না। যন্ত্রপাতি যদি কোনো মূল্য না হারায় এবং অন্য দ্রব্যে তা সংরক্ষিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে এদের কোনো মূল্যই নেই অর্থাৎ এরা মানুষের শ্রমোৎপাদিত নয়। এরা নতুন দ্রব্যোৎপাদনে সাহায্য করতে পারে, বিনিময়-মূল্য গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন হাত এদের নেই।

শ্রমিক একই শ্রম-প্রক্রিয়ায় যেমন মূল্য সংরক্ষণ করছে, তেমনি আবার মূল্য-সংযোজনও করছে- তার জন্য তাকে দুবার শ্রম করতে হয় না, পুঁজিপতিকেও অতিরিক্ত কোন খরচ বহন করতে হয় না। শিল্প-ব্যবসায় যতক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে চলে, ততক্ষণ পুঁজিপতি মুনাফা সংগ্রহে এতো ব্যস্ত থাকে যে শ্রমের এই দানের কথা স্মরণ করার সময়ই তার থাকে না। সঙ্কট ও দুঃসময় উপস্থিত হলে এই ঘটনাটা স্মরণ করার সুযোগ তার ঘটে। সঙ্কটের সময়ে সহসা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় অনেকখানি বন্ধ হয়ে যায় বলে উৎপাদনও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলে, যে সব কাঁচামাল পুঁজিপতি আগে থেকে সংগ্রহ করে রেখেছে সেগুলো এবং যন্ত্রপাতি বিনা ব্যবহারে নষ্ট হতে থাকে। উৎপাদন নেই বলেই এদের মূল্য দ্রব্যান্তর হয়ে সংরক্ষিত হবার সুযোগ পায় না। নিরন্তর উৎপাদনের কাজ না হলে অপচয় অবশ্যম্ভাবী। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে দেখা গেল যথার্থত ব্যবহৃত ও বিনষ্ট হয়েছে এদের ব্যবহার-মূল্য, মূল্য নয়। সুতরাং মূল্যের পুনঃসৃষ্টি হয়েছে বলা ঠিক নয়, নতুন উৎপাদিত দ্রব্যে এই মূল্য মাত্র পুনঃপ্রকাশিত ও সংরক্ষিত হয়েছে–এরূপ বলাই ঠিক। উৎপাদন হয়েছে নতুন দ্রব্যের ; এই নতুন দ্রব্যে পুরনো বিনিময়মূল্যের মাত্র পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

শ্রম প্রক্রিয়ায় শ্রম-শক্তির প্রয়োগের কথা স্বতন্ত্র। ধরা যাক যেন শ্রমিককে মাত্র ৬ ঘন্টাই খাটানো হয়েছে ; যে মূল্য সংরক্ষিত হয়েছে তার সাথে সংযুক্ত হলো এই নতুন মূল্য ; এই মূল্যের অস্তিত্ব আগে ছিল না, সুতরাং এটি সম্পূর্ণই মৌলিক। কিন্তু আমরা ভুলি নি যে শ্রম-শক্তি কেনার জন্যে যে অর্থ পুঁজিপতি খরচ করেছে, এই মূল্য তারই সমান। এই খরচেরই পরিবর্তে সে পেয়েছে শ্রম-শক্তি। আমরা আগেই জানি, ছয় ঘন্টার বেশি সময় শ্রমিককে খাটানো সম্ভব। শ্রম-শক্তির প্রয়োগে শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান মূল্যেই যে খালি উৎপাদিত হয়েছে তা-ই না, আরো বেশি মূল্য সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে। গোটা দ্রব্যটার যে মূল্য তা থেকে উৎপাদনের উপকরণগুলো মূল্য বাদ দিলে যা থাকে সেটাই হলো উদ্বৃত্ত-মূল্য অথবা পুঁজিপতির মুনাফা। একদিকে শ্রম-শক্তি ও অন্যদিকে উৎপাদনের উপকরণ-শ্রম-প্রক্রিয়ার এই সব বিভিন্ন উপাদানে পুঁজিপতি তার মুদ্রাকে পরিবর্তিত করলে মূল পুঁজি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতিকে বলা হয় পুঁজির অপরিবর্তমান অংশ, অথবা শুধুমাত্র অপরিবর্তমান পুঁজি।

অন্যদিকে পুঁজির যে অংশটুকু শ্রম-শক্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভেতরে তার মূল্যের পরিবর্তন হতে পারে। শ্রম-শক্তির প্রয়োগ আপন মূল্যের সমান মূল্য পুনরুৎপাদন করে ও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। একে বলা যেতে পারে, পুঁজির পরিবর্তমান অংশ। শ্রম প্রক্রিয়ার দিক থেকে উৎপাদনের যে সব

উপকরণকে আমরা বস্তু-উপকরণ (কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি) ও মনুষ্য উপকরণ (শ্রম শক্তি) আখ্যা দিয়েছি, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিক থেকে তাদেরই আমরা বলতে পারি, অপরিবর্তমান পুঁজি ও পরিবর্তমান পুঁজি।

পুঁজিপতি প্রথমে যে পুঁজি খাটায় তাকে আমরা 'C' চিহ্নটির দ্বারা বুঝাতে পারি। এই c-এর দুটি অংশ–একটা উৎপাদনের উপকরণ; একে আমরা বলব ছোট 'c'; অন্যটা শ্রম-শক্তি, এর নাম দেব 'v'। 'c' পুঁজির অপরিবর্তমান অংশ, আর 'v' পুঁজির পরিবর্তমান অংশ। সমগ্র পুঁজি অর্থাৎ 'C' হল 'c' ও 'v' এর সমষ্টি। সমগ্র পুঁজির পরিমাণ যদি হয় ৫০০ পাউন্ড, আর এর অপরিবর্তমান অংশ হয় ৪১০ পাউন্ড এবং পরিবর্তমান অংশ হয় ৯০ পাউন্ড, তা হলে সমীকরণটি দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

৫০০ পাউন্ড =৪১০ পাউন্ড+ ৯০ পাউন্ড

উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষ হলে আমরা দেখতে পাই যে নতুন উৎপাদিত দ্রব্যের মোট মূল্য হয়েছে (c+v)+s অথবা (৪১০ পাউন্ড+ ৯০ পাউন্ড) + ৯০ = ৫৯০ পাউন্ড, s = ৯০ পাউন্ড– এখনো উদ্বৃত্ত-মূল্য, মূল পুঁজির পরিমাণ বেড়ে C থেকে C এ পরিণত হলো।

আমরা দেখলাম, C = c+v, C = (c+v) + s.

অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্য দ্রব্যান্তর হয়ে নতুন দ্রব্যে সংরক্ষিত হয়েছে। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভেতর যে নতুন মূল্য সৃষ্টি হয়েছে তা হলো v+s, শ্রম-শক্তির মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যের সমষ্টি। 'C' অপরিবর্তমান বলেই একে আমরা পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির প্রয়োজনে শূন্য ভেবে নিতে পারি। উদ্বৃত্ত মূল্য পরিবর্তমান পুঁজি অর্থাৎ v-র ভেতরে পরিবর্তনের ফলাফল। v-র এই পরিবর্তনকে আমরা সহজ করে বলতে পারি যে, ৬ ঘন্টা শ্রমিককে কাজ করিয়ে শ্রম-শক্তির মূল্য উঠিয়েও আরো বেশি তাকে খাটানো সম্ভব। তাতে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয়।

প্রথম দৃষ্টিতে অপরিবর্তমান পুঁজিকে শূন্যের সাথে সমীকৃত করায় উদ্ভট ঠেকতে পারে; অথচ এটাই আমরা কার্যত প্রতিদিন করছি। বস্ত্র-ব্যবসায় থেকে কোনো একটা বছরে ইংল্যান্ডের কতো মুনাফা হলো যদি আমরা তার হিসাব করি, তবে প্রথমেই ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে তুলা ইত্যাদি বাবদ যে খরচ হয়েছে তা বাদ দিয়ে নেই। এই বাদ দেয়ার অর্থ হলো, নতুন দ্রব্যের ভেতর যে মূল্য সংরক্ষিত হয়েছে তাকে শূন্যের সমানই ধরলাম।

সমগ্র দ্রব্যটার মূল্য হতে অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্যের অংশ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে v+s অর্থাৎ ১৮০ পাউন্ড। এটি সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্ট মূল্য; এর ভেতরে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ ৯০ পাউন্ড পরিবর্তমান পুঁজি শতকরা কি হারে বেড়েছে সে হিসেবকে দেখে বুঝতে হবে S, V-র কত অংশ। পরিবর্তমান পুঁজির মূল্যের আপেক্ষিক বৃদ্ধি অথবা উদ্বৃত্ত মূল্যের আপেক্ষিক পরিমাণকে $\frac{s}{v} = \frac{৯০}{৯০}$, ১০০ পার্সেন্ট এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই আপেক্ষিক পরিমাণকে সহজ কথায় বলা চলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। অধিক খাটুনিটুকুর পরিমাণ ৬ ঘন্টা না হয়ে যদি ৩ ঘন্টা হতো এবং মোট খাটুনি হতো ৯ ঘন্টা তা হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার নেমে আসত ৫০

পার্সেন্ট। আবার ৬ ঘন্টা না হয়ে ১২ ঘন্টা যদি হতো এবং মোট খাটুনি হতো ১৮ ঘন্টা, তাহলে এই হার উঠে আসতো ২০০ পার্সেন্টে।

৬ ঘন্টা খেটে শ্রমিককে ৩ শিলিং-এর মূল্য উঠাতে হয় শ্রম-শক্তির জন্য। যে সব ব্যবহার্য শ্রমিকের চাই, যদি সেগুলোর দাম কমে যায় তা হলে শ্রম-শক্তির মূল্যও সেই অনুপাতে কমবে। আবার ব্যবহার্যের মূল্য বাড়লে, শ্রম-শক্তির মূল্যও বাড়বে। শ্রমশক্তির মূল্য উঠানোর জন্য শ্রমিককে খাটতেও হবে অধিক সময়। এই মূল্য উঠানোর জন্য যে সময় শ্রমিককে খাটতে হয় তার পরিমাণ আমরা ধরে নিয়েছি ছয় ঘন্টা। পুঁজিপতির জন্য না খেটে স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকার জন্য খাটলেও এই ৬ ঘন্টা তাকে খাটতে হতো। এই খাটুনিতে যে মূল্য উৎপাদন হলো, তা 'v' অর্থাৎ শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান। যে সময়টুকু শ্রমিককে খাটতেই হবে আপন শ্রম-শক্তির মূল্যটুকু উৎপাদনের জন্য, তাকে বলা হয় 'আবশ্যক শ্রম-সময়'। জীবিকার জন্য এই সময়টুকু খাটতে হয়।

শ্রম-প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তরে শ্রমিক শ্রম করে সত্যি কিন্তু তা কখনো তার নিজের জীবিকার জন্য প্রয়োজন নেই। ঐ সময়ে সে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিপতির কাছে এই উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণই শূন্য থেকে, এর জন্যে তার কোনো খরচ নেই। এই সময়টুকুকে আমরা বলতে পারি উদ্বৃত্ত-সময়। দাস প্রথার উপর ভিত্তি করে এবং মজুর প্রথার উপর ভিত্তি করে যে অর্থনৈতিক যুগ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ভিতরের মূলগত প্রভেদ আবিষ্কার করতে হলে দেখতে হবে, কি ভাবে প্রকৃত উৎপাদনকারী হতে এই উদ্বৃত্ত-সময়টা আদায় করে নেওয়া হয়।

পুঁজি কর্তৃক শ্রম-শক্তিকে যে পরিমাণে শোষিত হতে হচ্ছে তার মাত্রা আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার দ্বারাই বুঝতে পারি।

আমরা আগের উদাহরণটি থেকে দেখেছি, 's'কে 'v'-এর অনুপাতে দেখেই তবে শোষণের হার নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু পুঁজিপতিরা s-কে c+v এর সাথে অনুপাত করে দেখাতে চায় তার যা সংগ্রহ করে তার পরিমাণ কতো অল্প।

$$\frac{s}{c+v} = \frac{৯০}{৪১০+৯০} = \frac{৯০}{৫০০} = ১৮\%$$

অথচ আমাদের হিসাবে শোষণের মাত্রা হয়েছে ১০০%। এই প্রসঙ্গে আমাদের শুধু এটুকু মনে রাখা প্রয়োজন, sকে c+v-র সাথে অনুপাত করলে আমরা মুনাফার হারটাই জানতে পারি– তা কখনো উদ্বৃত্ত মূল্যের হারও নয়, শোষণের মাত্রার পরিচায়কও নয়।

শ্রম-শক্তির ক্রয় ও বিক্রয় হয় তার উপযুক্ত মূল্যে, এই অনুমান থেকেই আমরা বিচার শুরু করেছিলাম। সব পণ্যের মূল্য যেমন নিরূপিত হয়, তেমনি এর মূল্যও নির্ধারিত হয় যে সময়টুকু শ্রম-শক্তির উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন, তা দিয়ে। প্রতিদিনের শ্রম-শক্তির উৎপদন ও পুনরুৎপাদনের জন্যে তাকে এই সময়টা খাটাতে হবে। আমরা এখানে 'আবশ্যক শ্রম-সময়' এর পরিমাণ ছয় ঘন্টা ধরে নিলাম, কিন্তু প্রতিদিন মোট কয় ঘন্টা খাটতে হবে তা এখনও আমরা জানতে পারলাম না। ধরে নেয়া যাক যে A-B রেখাটার দৈর্ঘ্য 'আবশ্যক শ্রম সময়ের' বা ছয় ঘন্টার নির্দেশক।

এই ছয় ঘন্টাকে যথাক্রমে এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা ও তিন ঘন্টায় যদি বাড়ানো হয় তা হলে আমাদের আরো তিনটে রেখা আঁকতে হবে। ১ নং শ্রম দিবস, A-B-C ; ২ নং শ্রম দিবস A-B-C ; ৩ নং শ্রম দিবস A-B-C; শ্রম দিবস হলো যথাক্রমে ৭ ঘন্টা, ৯ ঘন্টা ও ১২ ঘন্টা। তিনটে লেখ্যতেই B-C হলো A-B-র বিস্তার মাত্র। এই B-C উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। শ্রম দিবস A-B এবং B-C-র সমষ্টি বলেই এর অবস্থান্তর হয় B-C-র পরিবর্তনের সঙ্গে। A-B অপরিবর্তমান বলেই B-C , A-B-র কতো অংশ তা গণনা করা সম্ভব। প্রথম শ্রমদিবসে তা $\frac{১}{৬}$; দ্বিতীয় শ্রমদিবসে $\frac{৩}{৬}$; তৃতীয় শ্রমদিবসে $\frac{৬}{৬}$; আমরা জানি যে 'উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়' ও ' আবশ্যক শ্রম-সময়' এর সম্বন্ধই হলো উদ্বৃত্ত মূল্যের হার। আমাদের লেখ্যটিতে B-C ও A-B -র সম্বন্ধ দিয়েই তা নিরূপিত হবে। তিনটি বিভিন্ন শ্রমদিবসে উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই হার যথাক্রমে ১৬$\frac{২}{৩}$%, ৫০% ও ১০০% হয়েছে। খালি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার জানলেই আমরা কতো ঘন্টার শ্রম দিবস তা জানতে পারি না। ১০০% যদি উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হয়, তা হলে শ্রমদিবস ৮ ঘন্টা, ১০ ঘন্টা, ১২ ঘন্টা বা আরো বেশি ঘন্টারও হতে পারে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার কতোটা তা দেওয়া থাকলে আমরা শুধু এটুকুই বুঝতে পারি যে 'আবশ্যক শ্রম-সময়' ও 'উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়' দুই-ই সম পরিমাণ ; এরা যে কতো ঘন্টা পরিমাণের তা বুঝতে পারি না।

শ্রম দিবস, তা হলে, অপরিবর্তমান নয়, এটা পরিবর্তন-সাপেক্ষ। এই শ্রম দিবসের একটা অংশ অবশ্য শ্রমিকের শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনের জন্যে যতো সময় প্রয়োজন হয় তার দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। অন্য অংশটা এবং সমগ্র শ্রম- দিবসটা নির্দিষ্ট হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ দ্বারা।

শ্রম দিবসের নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। অধমমান হলো সমগ্র B-C টাকে বিলোপ করে দেওয়া, তা হলে থাকে শুধু A-B। শ্রমদিবসকে 'আবশ্যক শ্রম সময়ের'সমান করে রাখা পুঁজিপতির স্বার্থ নয়; সুতরাং উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়কে সম্পূর্ণ বিলোপ করা পুঁজিপতির স্বার্থ বহির্ভুত। চরমমান হলো B-C-কে যথাসম্ভব বাড়িয়ে গোটা শ্রমদিবসকে ২৪ ঘন্টার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। অবশ্য ২৪ ঘন্টা কখনো শ্রম-দিবস হতে পারে না। কেননা তা শ্রমিকের শারীরিক সামর্থের বাইরে।তা ছাড়াও, শ্রমিককে যথেচ্ছ ভাবে খাটানোর বিরুদ্ধে একটা নৈতিক দিকও আছে; শ্রমিক তার মানসিক ও সামাজিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্যেও সময় দাবী করতে পারে। শ্রমিকের সুপক্ষে এই দুটো যুক্তি থাকলেও আমরা দেখতে পাই শ্রম দিবস ৮ ঘন্টাও যেমন হয় আবার ১৮ ঘন্টাব্যাপীও হতে পারে।

পুঁজিপতি শ্রম-শক্তি কিনেছে দৈনিক হারে। সে একটা পুরো শ্রমদিবসব্যাপী এই শ্রম শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে; শ্রমিকের উপর এই অধিকার সে অর্জন করেছে। কিন্তু শ্রম দিবসটা কি ?

যেমনই হোক, এই শ্রমদিবসকে স্বাভাবিক দিনটার আয়তন থেকে কম হতে হবে। কিন্তু কতো কম ? শ্রমদিবসটার আয়তন সম্পর্কে পুঁজিপতির নিজস্ব একটা মতামত আছে। তার নিজের আত্মা পুঁজিরই আত্মা। কিন্তু পুঁজির জীবনের একমাত্র প্রেরণা মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য এর অপরিবর্তমান

অংশটি দ্বারা অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল দিয়ে সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত-শ্রম ব্যবহার করা।

পুঁজি পুরনো জড়ীভূত শ্রম; কিন্তু তা বেঁচে থাকে সজীব শ্রমের রক্ত চুষে। যতো বেশি রক্ত সে শুষে নিতে পারবে ততই তার আয়ুবৃদ্ধি হবে। যে সময়টা শ্রমিক কাজ করে তা হলো পুঁজিপতি দ্বারা তার ক্রীত শ্রম-শক্তির সদ্ব্যবহার মাত্র। বাজারে শ্রমশক্তি ক্রয় করে কারখানায় তাকে যথেচ্ছ খাটানোর জন্যে এতো বেশি কায়িক অপচয় হয় যে, যে মূল্য শ্রম শক্তির জন্যে দেয়া হয় তা দিয়ে শ্রমিক তার অপচয়কে পূরণ করে নিতে পারে না। পুঁজিপতি যথেচ্ছ তাকে খাটাবার অধিকার বজায় রাখতে উদ্যত; অন্যদিকে শ্রমিকও শ্রমদিবসকে উপযুক্ত সময়ের ভেতর নির্দিষ্ট রাখার জন্যে সচেষ্ট। এই বিরোধী অধিকারের দাবীর মিমাংসার জন্যে প্রয়োজন হয় শক্তি প্রয়োগ এবং জবরদস্তির। তাই পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের ইতিহাসে আমরা দেখি, শ্রমদিবস যে কতো ঘন্টায় নির্দিষ্ট হবে তা ঠিক হয় সংগ্রামের মাধ্যমে। এই সংগ্রামের দুই পক্ষ হল, সমষ্টিগত পুঁজি অথবা পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিক অথবা শ্রমিকশ্রেণী।

পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ যদি বাড়ানো যায় অর্থাৎ বেশি সংখ্যক শ্রমিককে যদি নিযুক্ত করা যায়, তবে উদ্বৃত্ত-মূল্যও আদায় করা যায় বেশি পরিমাণে। অন্যভাবেও এর পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। শোষণের মাত্রা অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বাড়াতে পারলেও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়তে পারে। একজন শ্রমিকের ৬ ঘন্টা উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়কে যদি ৯ ঘন্টায় পরিণত করা যায়, তা হলে তার কাছ থেকে বেশি পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ করা হলো। তা হলে দেখা গেল, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার অথবা পরিবর্তমান পুঁজিকে বাড়ালেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট পরিমাণের উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি এমন দেখা যায় যে একটি কমেছে, তা হলে অন্যটাকে বাড়ালেই নির্দিষ্ট পরিমাণটা সংগৃহীত হতে পারে। যে হারে হয়ত বা পরিবর্তমান পুঁজি কমেছে ঠিক সেই হারে যদি শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া যায় তা হলে পূর্বের পরিমাণেই উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগৃহীত হবে। পুঁজিপতি ১০০ জন শ্রমিকের জন্যে প্রতিদিন ৩০০ শিলিং খরচ করলে এবং ৫০% হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করলে মোট ১৫০ শিলিং হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ। এখন এখন পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ যদি অর্ধেক করা হয়, অর্থাৎ ১০০ জন শ্রমিককে না খাটিয়ে সেই জায়গায় ৫০ জনকে খাটানো হয়, অথচ উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকে উঠিয়ে ৫০% থেকে ১০০% করা হয় অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রমের সময় ৩ ঘন্টা থেকে ৬ ঘন্টায় পরিণত করা যায় তা হলেও উদ্বৃত্ত- মূল্যের পরিমাণ ১৫০ শিলিংই থাকবে। আগে যেমন ১০০ জন শ্রমিক থেকে ৩ ঘন্টা করে ১০০×৩ = ৩০০ উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় সংগ্রহ করা হতো, এখনও তেমনি ৫০ জনের কাছ থেকে ৫০×৬=৩০০ উদ্বৃত্ত শ্রম সময়ই সংগ্রহ করা হচ্ছে। সুতরাং দুই অবস্থাতেই একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন হলো।

এই বিচার থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, পরিবর্তমান পুঁজি কমিয়ে সমানুপাতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বাড়ালেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই সিদ্ধান্তটাকে অন্যভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে। শ্রমিকের সংখ্যা

কমিয়ে যে হারে তাদের সংখ্যা কমানো হলো সেই হারে যদি তাদের উদ্বৃত্ত শ্রম বাড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণের দিক থেকে ফলাফল একই থাকে। উদ্বৃত্ত মূল্যের হার কমিয়ে শ্রমিকের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়ালেও একই ফল দেখা যাবে।

শ্রমিকের সংখ্যা যদি একটি বিশিষ্ট দেশে দশ লক্ষ ধরা যায়, তবে তাদের প্রতিদিন ১০ ঘন্টা করে খাটিয়ে ১ কোটি ঘন্টা কাজ আদায় করা যেতে পারে। শ্রমদিবস যদি দশ ঘন্টায়ই নির্দিষ্ট রাখা যায়, এটি আর বাড়ানোর সুযোগ না থাকে, তা হলে শুধুমাত্র শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়েই উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ানো সম্ভব। সকলের পুঁজি মোট কতো উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ করবে তা এই অবস্থায় নির্ভর করে শ্রমিকের মোট সংখ্যার উপরে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন থেকে আমরা দেখলাম, যে কোনো পরিমাণের মুদ্রাকেই ইচ্ছেমতো পুঁজিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করতে হলে একটা নির্দিষ্ট অধমমান চাই। একেবারে সর্বনিম্ন পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ হলো একজন শ্রমিকের শ্রম-শক্তির মূল্য। এখন এই শ্রম শক্তির মূল্য উঠানোর জন্যে যদি ৮ ঘন্টা শ্রমের প্রয়োজন হয়, তা হলে আর ৪ ঘন্টার উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করতে শ্রমিককে সেই পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণও দিতে হবে। কিন্তু শ্রমিকের কাছ থেকে ৪ ঘন্টার উদ্বৃত্ত-মূল্য উঠিয়ে সে শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদনের অর্ধেক মাত্র নিজে লাভ করে। সুতরাং একজন শ্রমিক যে পরিমাণ মূল্য তার শ্রম-শক্তির জন্যে পায় সেই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উঠিয়ে সাধারণ একজন শ্রমিকের মতো জীবন যাপন করতে হলে ৮ ঘন্টার উদ্বৃত্ত-মূল্য উঠানোর জন্যে তাকে ২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করতে হবে। কিন্তু তাতে মাত্র নিজের জীবন ধরনের জন্যে রসদই সংগ্রহ হতে পারে, পুঁজির যে আসল উদ্দেশ্য, শুধু আত্মা-প্রসারণ, তা কখনো সংঘটিত হতে পারে না। শ্রমিক যে ভাবে জীবন-যাপন করে তা থেকে দ্বিগুনণস্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেও, মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধাংশকে যদি পুঁজিঁতে পরিণত করতে হয় তবে শ্রমিকের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণ-এর পরিমাণও আটগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। অবশ্য তার অধীনস্থ শ্রমিকের মতো সে নিজেও কাজ করতে পারে, কিন্তু তখন সে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মিশ্রণজাত একটা কিছু। তাকে বলা যেতে পারে একজন ক্ষুদে মনিব। মধ্যযুগের গিল্ডগুলো এই ক্ষুদে মনিব যাতে পুঁজিপতিতে পরিণত না হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র করেছিলো-'একজন মনিব নির্দিষ্ট একটা সংখ্যার বেশি শ্রমিক নিযুক্ত করতে পারবে না'। মধ্যযুগে পুঁজিপতির যা ছিলো শ্রেষ্ঠ পুঁজির পরিমাণ, তা এখনকার যুগের সর্বনিম্ন পুঁজি হবারও উপযুক্ত নয়। হেগেলের একটা কথা আছে, পরিমাণাত্মক বৃদ্ধি হতে হতে একটা বিশেষ জায়গায় এসে যখন এই বৃদ্ধি উপনিত হয়, তখন সহসা আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের গুণাত্মক প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের জগতেই যে এই কথাটি খাটে তা নয়, উৎপাদনের জগতেও তা খেটে যায়। মুদ্রার পরিমাণ এক থেকে বেড়ে ৯৯ এ যখন পৌছায়, তখনও মানুষের হাতে তা মাত্র ক্রয়শক্তি: কিন্তু যখনই আরো এক বেড়ে ১০০ হয়, তখন তা পরিণত হয় পুঁজিতে। পুঁজিতে মুদ্রা এখন শ্রমশক্তি কেনার ক্ষমতা অর্জন করে পুঁজি হয়। পুঁজি হতে হলে মুদ্রার পরিমাণ কতোখানি হতে হবে তা সামাজিক

অবস্থার উপর নির্ভর করে। আগে হয়ত বা ৫০০ পাউন্ড হলেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্ভব হতো ; এখন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে এবং নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ বের হওয়ার কারণে ৫০০০ পাউন্ডের কমে উৎপাদন সম্ভব হয় না। বিভিন্ন উৎপাদনে বিভিন্ন পরিমাণের সর্বনিম্ন পুঁজি প্রয়োজন হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিতর আমরা দেখেছি, পুঁজি শ্রমের উপর অধিকার স্থাপন করেছে। পুঁজিপতি সব সময়ই সতর্ক ও সচেষ্ট থাকে যেন শ্রমিক নিয়মমতো এবং প্রাণপণ কাজ করে। তা ছাড়া, পুঁজি শ্রমিকের সাথে স্থাপন করে শোষণের সম্পর্ক। পুঁজিতন্ত্র শুরু হলে শ্রমিক অবশ্য পরবশ্যতা স্বীকার করল, কিন্তু তখনো উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বদলায় নি, আগের মতোই রয়েছে। তা হলে দেখা গেল যে, সেই অবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ এবং এর বৃদ্ধি, উৎপাদনের যন্ত্রপাতির পরিবর্তনের উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে শ্রম দিবসের ঘন্টা বাড়িয়ে করা হতো। সেকেলে রুটি তৈরির কারখানায় এবং নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্রবহুল বয়ন-ফ্যাক্টরীতে সবখানেই উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহের উদ্যম সমানভাবেই রয়েছে।

একটা সরল শ্রম-প্রক্রিয়া হিসাবে যদি আমরা উৎপাদনকে দেখি, তা হলে উৎপাদনের উপকরণাদি কখনো শ্রমিকের সাথে পুঁজির সম্পর্কে দাঁড়াতে পারে না। এগুলো তার কাছে উৎপাদনের সহায়করূপে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এই সম্বন্ধটা সম্পূর্ণ বদলে যায়, যখন উৎপাদনকে আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহের উপায়রূপে দেখি। উৎপাদনের উপকরণগুলোকে তখন আমরা দেখে থাকি অন্যের শ্রমকে নিংড়ে বের করার উপায় হিসাবে। তখন আর শ্রমিক যন্ত্রকে চালায় না, যন্ত্রই শ্রমিককে নিয়ন্ত্রিত করে ও তার কর্তৃত্বাধীনে রাখে। যন্ত্রপাতিকে রাতের সময়টাতে কর্মবিরত অবস্থায় থাকতে হয় বলে পুঁজিপতি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ ভাবতে বাধ্য হয়। সে চায়, ২৪ ঘন্টাই যদি শ্রমিককে যন্ত্র দিয়ে শোষণ করা যেতো।

আমরা দেখেছি, 'অবশ্য শ্রম-সময়' অপরিবর্তনীয়, কিন্তু দিবসটার পরিবর্তন সম্ভব। 'অবশ্য শ্রম-সময়' এর বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। একটা শ্রমদিবসের বিভিন্ন অংশকে আমরা নীচের লেখটি দিয়ে বুঝাতে পারি।

a--------b---------c

সমস্ত রেখাটি ১২ ঘন্টার শ্রমদিবসকে বুঝাচ্ছে, a-b দশ ঘন্টার 'অবশ্যক শ্রম-সময়' এবং b-c দুই ঘন্টার 'উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়'। এখন প্রশ্ন উঠবে, a-c কে আর না বাড়িয়ে অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ কি করে সম্ভব। a-c দৈঘ্যটি অপরিবর্তনীয় হলে কে আরো বাড়ানো সম্ভবপর। b কে আমরা a-র দিকে সরিয়ে নিলেই b-c কে আরো বড়ো করে পেতে পারি। ধরা যাক b'-b+b-c-র অর্ধাংশ অথবা মাত্র ১ ঘন্টার তুল্য।

$$a\frac{b'}{1}b-c$$

b-কে যদি আমরা a-র দিকে সরিয়ে b' করি, b-c অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় হলো b'-c অথবা ৩ ঘন্টা। উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় দুই ঘন্টার স্থানে তিন ঘন্টা হলো বটে, কিন্তু মোট শ্রমদিবসটার ঘন্টা আগের মতো ১২ ঘন্টাই থাকলো। কিন্তু এই ঘটনাটা সম্ভব হলো একমাত্র অবশ্য-শ্রমসময়কে ১০ ঘন্টা থেকে ৯ ঘন্টায় পরিণত করে। উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের বৃদ্ধি অর্থই হলো অবশ্য শ্রম- সময়কে কমিয়ে দেওয়া। যে সময়টুকু

শ্রমিক তার গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্যে খাটে, তারই একটি অংশকে সে পরিণত করে উদ্বৃত্ত-শ্রমসময়ে। শ্রমদিবসটার দৈর্ঘ্যের ভেতর কোন পরিবর্তন ঘটল না। পরিবর্তন ঘটল অবশ্য শ্রম-সময় এবং উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের পরিমাণের ভেতর। প্রতি ঘন্টায় যদি ৬ পেন্সের মূল্য উৎপাদন হয়, তা হলে ১০ ঘন্টা 'অবশ্যক শ্রমসময়ের' উপযুক্ত মূল্য হবে ৫ শিলিং। এই আবশ্যক শ্রম সময় ১ ঘন্টা কমে যাওয়ায় যে মূল্য শ্রমিক এখন পাবে তা ৪½ শিলিং মাত্র। এভাবে জবর-দস্তির সাহায্যে পুঁজিপতি যে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করে নেয় তা অবিসংবাদিত সত্য, কিন্তু আমরা বর্তমান বিচার ও আলোচনায় ধরে নিয়েছি যে, সমান-সমান মূল্যের ভেতরেই বিনিময় হবে; এই দিক থেকেই আমরা উদ্বৃত্ত-শ্রম সময় বৃদ্ধির বিষয়টা আলোচনা করব। তা হলে আমরা ধরে নিলাম যেন শ্রমশক্তির মূল্যই বাজারে কমেছে, জবরদস্তির মাধ্যমে শ্রমিককে কম নিতে বাধ্য করা হয়নি। শ্রম-শক্তির মূল্য হ্রাস পেয়েছে অর্থ, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে শ্রমিকের যে সব উপকরণ প্রয়োজন হতো তা এখন সে অল্প মূল্যেই অর্থাৎ ৫ শিলিং-এ না কিনে ৪½ শিলিং -এ কিনতে পারে। এই ৪½ শিলিং এর মূল্য প্রস্তুত করতে তার ৯ ঘন্টা সময় লাগে। সুতরাং দেখা গেল, শ্রমিক যেমন তার উপযুক্ত মূল্য পেল, ঠিক তেমনি পুঁজিপতির লভ্যাংশও ফলস্বরূপ বাড়তে পারল।

মুল্যের এই হ্রাস সম্ভব হতে পারে, জীবনধারণের উপকরণাদির মূল্য হ্রাস পেলে তবেই। অন্যদিকে, শ্রমিকের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস আবার সম্ভব হয় শ্রমের উৎপাদনীশক্তির বৃদ্ধি হতে। শ্রমের উৎপাদনীশক্তি বৃদ্ধি করার আগে প্রয়োজন হবে উৎপাদনের উপকরণাদির অর্থাৎ উৎপাদনরীতিরই আমূল রূপান্তর। একমাত্র এই উপায়েই শ্রমশক্তির মূল্য কমানো যেতে পারে। তা হলেই এই মূল্য উৎপাদনের জন্যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েরও প্রয়োজন হবে। ফলে আবশ্যক শ্রম-সময় কমে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বাড়বে।

শ্রমদিবসের ঘন্টা বাড়িয়ে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করা হয় তাকে বলা চলে 'অনপেক্ষ উদ্বৃত্ত-মূল্য'; শ্রমদিবসের ঘন্টা না বাড়িয়ে 'অবশ্য শ্রমসময়' কমিয়ে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানো হয় তাকে বলে 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য'।

উৎপাদনের ভেতর দেখা যায়, একজন বিশিষ্ট উৎপাদন-কর্তা উৎপাদনের খরচ অপেক্ষাকৃত কমিয়ে অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদনী-শক্তি বাড়িয়ে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য রাখতে চেষ্টা করে। একঘন্টার শ্রম যদি ৬ পেন্সের সমান হয়, তা হলে ১২ ঘন্টায় সৃষ্টি হবে ৬ শিলিং। ধরা যাক, এইবার ১২ টা দ্রব্য ঘন্টায় প্রস্তুত হয়। প্রত্যেকটার ভেতর উৎপাদনের উপকরণ রয়েছে ৬ পেন্সের। এই অবস্থায় প্রত্যেকটা দ্রব্যের মোট মূল্য ১ শিলিং। এখন একজন বিশিষ্ট উৎপাদক শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি করে এমনভাবে উৎপাদনের আয়োজন করল ১২ ঘন্টায় ১২টির জায়গায় ২৪ টি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ধরা যাক, যেন উৎপাদনের উপকরণসমূহের মূল্যের কোন তারতম্য হয় নি; তা হলে পুরনো মূল্য প্রত্যেকটা দ্রব্যের ভেতর আগের মতোই থাকবে, নতুন মূল্য প্রত্যেকটা দ্রব্যে সংযোজন হবে আগের চেয়ে অর্ধেক। এ অবস্থায়, এক একটা দ্রব্যের মোট মূল্য হল ৯ পেন্স। এই দ্রব্যের সমাজ নির্ধারিত মূল্য ১ শিলিং, কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য মাত্র ৯ পেন্স। কিন্তু প্রকৃত মূল্য

ব্যক্তি বিশেষের মূল্য নয়, সমাজ নির্ধারিত মূল্য। সুতরাং এই নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করলে পুঁজিপতির তিন পেন্স অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ হলো। সে যদি ১০ পেন্সেও বিক্রি করে, তবুও তার ১ পেন্স অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ হবে। প্রত্যেক উৎপাদন কর্তারই উদ্দেশ্য থাকে উৎপাদনশক্তি অন্যের চেয়ে বাড়িয়ে পণ্যের মূল্য কমিয়ে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা।

যাহোক, ১০ পেন্স হারে ২৪ টা পণ্য পুঁজিপতি বিক্রি করবে মোট ২০ শিলিং-এ। এই ২০ শিলিং-এর ভেতর ১২ শিলিং হলো উৎপাদনের উপকরণসমূহের মূল্য; এই অংশটুকু বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৮ শিলিং, এই আট শিলিং হলো নতুন উৎপাদিত মূল্যের সমতুল্য। ৮ শিলিং থেকে আবার ১০ ঘন্টা আবশ্যক শ্রমসময়ের ৫ শিলিং বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩ শিলিং। আগে সবার জন্যে আবশ্যক শ্রমসময় ৫ শিলিং হলে উদ্বৃত্ত শ্রমসময় হয়েছে ১ শিলিং ; অথচ এই বিশেষ শ্রমকর্তার বেলায় উদ্বৃত্ত শ্রমসময় হয়েছে ৩ শিলিং; ১২ ঘন্টাকেও আমরা এই অনুপাতে ভাগ করতে পারি ; সকলের পক্ষে আবশ্যক শ্রমসময় ১০ ঘন্টা এবং উদ্বৃত্ত শ্রমসময় ২ ঘন্টা ; কিন্তু আমাদের বিশেষ উৎপাদনকর্তাটার বেলায় আবশ্যক শ্রমসময় হয়েছে ৭ $\frac{১}{২}$ ঘন্টা আর উদ্বৃত্ত শ্রমসময় ৪ $\frac{১}{২}$ ঘন্টা। অর্থাৎ আমাদের বিশেষ পুঁজিপতিটির মুনাফা বেশি হলেও অন্য সবাই শ্রমিককে যা দেয়, সে-ও তাই দেবে। অথচ এই ৫ শিলিং সে তার শ্রমিককে দিয়ে মাত্র ১০ ঘন্টার জায়গায় ৭ $\frac{১}{২}$ ঘন্টায়ই প্রস্তুত করায়। তা হলে দেখা গেল, এই উপায়ে 'আবশ্যক শ্রম-সময়' কমিয়ে দেয়া সম্ভবপর ; যতোখানি কমানো হলো ততোখানি এই বিশিষ্ট পুঁজিপতি আত্মসাৎ করল উদ্বৃত্ত শ্রমসময়রূপে। কিন্তু এই ভাগ্যবান পুঁজিপতিটি বেশিদিন এই উদ্বৃত্ত মূল্যের অতিরিক্ত অংশটা ভোগ করতে পারবে না। অন্যান্য সব পুঁজিপতিই যখন এই নতুন উৎপাদন-প্রনালী গ্রহণ করবে তখন উদ্বৃত্ত মূল্যের অতিরিক্ত অংশটা কারো ভাগ্যে জুটবে না।

সমবায়

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন শুরু হয় যখন কোনো পুঁজিপতি একসঙ্গে বহু শ্রমিককে উৎপাদন-কাজে নিয়োজিত করে। ফলে শ্রমপ্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় বিপুল আকারে, উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যাও হয় বহু। একজন পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে ও আজ্ঞাধীনে বহু শ্রমিক এ ধরনের উৎপাদনে ব্রতী হবে, এটিই ইতিহসের দিক থেকে পুঁজিতন্ত্রের শুরু। পুঁজিতন্ত্রের গোড়ায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতির চেহারা বদলায় নি, পূর্বযুগেরই মতো ছিল তা ; সুতরাং পূর্বযুগের সাথে পুঁজিতন্ত্রের এই দিক থেকে বড় একটা প্রভেদ তখনো দেখা দেয় নি। একমাত্র প্রভেদ দেখা দিল, একজন পুঁজিপতি বহু শ্রমিককে সমবেতভাবে খাটিয়ে নেয়। এটুকু মাত্র বলা যেতে পারে, মধ্যযুগের হস্তশিল্প মনিবের ক্ষুদ্র কারখানাটা একটু বৃহদাকার ধারণ করেছে। উৎপাদনের হাতিয়ারপাতি তখনো হস্তশিল্পের স্তরেই রয়েছে। তাহলে দেখা গেল, পূর্বযুগের উৎপাদনের সাথে যে প্রভেদ সৃষ্টি হল, পুঁজিতন্ত্রের গোড়ার দিকটায় তা শুধু সংখ্যাত্মক, গুণগত নয় মোটেই। শ্রমিক হিসাবে রাম এবং যদু নিশ্চয়ই সমতুল্য

হতে পারে না ; একটু বিভিন্নতা তাদের থাকেই। ১০ জন লোক যদি পৃথক পৃথক ভাবে উৎপাদন করে, সকলের উৎপন্নের পরিমাণ সমান হতে পারে না। কিন্তু ১০ জনকে সমবেতভাবে উৎপাদন করতে দিলে একজনের নিম্নতা অন্যজনের বেশি উৎপাদনের ক্ষমতা দিয়ে পূরণ হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ বাগ্মী বার্ক একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এই বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন। প্রতিজনের পৃথক পৃথক উৎপাদনের তারতম্য দেখা যায় কিন্তু পাঁচজনের একটা দলকে যদি উৎপাদন করতে দেওয়া হয় এবং অন্য পাঁচজনের আর একটা দলও যদি উৎপাদন করে তাহলে দেখা যাবে যে এই দুই দলের উৎপাদনের ভিতর বড় একটা প্রভেদ ঘটে নি। পুঁজিপতি তার অধীনস্ত সমগ্র শ্রমিক দলটাকে একজন ব্যক্তি হিসাবেই দেখে। প্রত্যেকের শ্রমের ঘন্টা এখানে গড়পড়তা হিসাবে নিরূপিত হয়। একজন হয়তবা বেশি ঘন্টা কাজ করতে পারে, অন্যজন কম করতে পারে ; কিন্তু ১২ জন শ্রমিক প্রতিদিন ১৪৪ ঘন্টা কাজ করলে প্রতিজনের গড়পড়তা শ্রমের ঘন্টা হয় বারো। কিন্তু এই ১২ জনকে যদি ৬ টা বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক একজন পুঁজিপতির অধীনে কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেক দলের সাথে প্রত্যেক দলের মোট উৎপাদনে বিভিন্নতা প্রকাশ হবেই। একদলের মোট উৎপাদন হয়ত বা এতো কম হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা দ্রব্যের জন্য খরচ এতো বেশি পড়েছে যে, বাজারে এই দলের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রিই হবে না। পুঁজিপতি হিসাবে উৎপাদনের কর্তাকে দেখতে হবে, তার অধীনস্থ শ্রমিকরা যা উৎপাদন করবে তা যেন অন্য পুঁজিপতির অধীনস্থ শ্রমিকদের উৎপাদিত পরিমাণের সমান হয়। তা হলেই প্রত্যেক শ্রমিককে অন্তত গড়পড়তা শ্রম দিতে হবে ; এটি সম্ভব, ব্যক্তিশ্রমিক যখন সমষ্টি শ্রমিকের অঙ্গীভূত হয়ে কাজ করে।

সমবেত শ্রমিকদের দ্বারা সমষ্টিগত উৎপাদনে শ্রম প্রক্রিয়ার আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলোর ভেতরেও পরিবর্তন সংগঠিত হয়। গৃহ সরঞ্জাম এবং উৎপাদনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এখন একসঙ্গেই ব্যবহৃত হবে। ১০ জন শ্রমিকের শ্রমের জন্যে উপরোল্লিখিত যে সরঞ্জামের দরকার ১৫ জনের কাজের জন্যেও প্রায় তাতেই চলে যায়। এই সরঞ্জামগুলোর ব্যবহার-মূল্য সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হলো বলে যে তাদের বিনিময়মূল্য বাড়ল তা মনে করার কোনো কারণ নেই। যে ঘরে ২০ জন বয়নকারী কাজ করে তা এক জন বয়নকারীর কাজ করার মতো ঘরের চেয়ে যে বড়ো হবে তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুই দুই জন করে বয়নকারীর জন্যে ১০ টা পৃথক ঘর তৈরি করতে যে খরচ লাগবে ২০ জনের জন্যে একটা বড় ঘর তৈরি করতে তার চেয়ে কম খরচের প্রয়োজন। এই কথাটা উৎপাদনের বেলায়ও খাটে। বেশি লোক একত্র হয়ে খাটলে বেশি উপকরণের প্রয়োজন হবে সত্যি, কিন্তু আলাদা আলাদা খাটলে যে খরচ হতো তার সমান অনুপাতে তা বাড়তে পারে না। এই প্রকারের কম খরচের একমাত্র কারণ, বেশিসংখ্যক লোক সমষ্টিগতভাবে উৎপাদনকাজে নিয়োজিত হয়।

যখন বেশিসংখ্যক শ্রমিক একই শ্রমপ্রক্রিয়া অথবা পরস্পর সম্বন্ধে শ্রমপ্রক্রিয়ার ভিতর পাশাপাশি কাজ করে, তখন আমরা বলি যে শ্রমিকেরা পরস্পর সহযোগিতার সমবায় শক্তিতে কাজ করছে। একটা পদাতিক সৈন্যদলের সংহত শক্তি যেমন পৃথক পৃথক পদাতিকগণের ব্যক্তিগত শক্তির যোগফল হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তেমনি বহু শ্রমিকেরা সমবেতভাবে যে যান্ত্রিক শক্তিকে পরিচালনা করে তাও পৃথক পৃথক

শ্রমিকের শক্তি প্রয়োগের সমষ্টি থেকে ভিন্ন। সমবেত শ্রম হতে যে সব ফলাফল প্রসূত হয় তা কখনো পৃথক পৃথক শ্রমিকের শ্রম দিয়ে সম্ভব হতে পারে না। এই জায়গায় আমরা দেখলাম, সমবায়ের সাহায্যে ব্যক্তির উৎপাদন শক্তির যে শুধু বৃদ্ধি হলো তা-না, একটা নতুন শক্তির উদ্ভব হলো–এটি শ্রমিকগণের সমষ্টিগত শক্তি।

একটা দ্রব্য উৎপাদনে দশজনের কাজের প্রয়োজন হতে পারে। একজন শ্রমিককে যদি এই দশরকমের কাজই করতে হয় তা হলে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় দ্রব্য উৎপাদন খুবই শ্রম সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তা না করে ১০ জনকে যদি ১০ রকমের কাজে নিযুক্ত করা যায়, এবং প্রত্যেকেই একটা করে কাজই বারবার করে, তা হলে বেশি সংখ্যক দ্রব্য অল্প সময়ে উৎপাদন হওয়া সম্ভব হবে। কতগুলো উৎপাদনের ভেতর দেখা যায়, ঐ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিতর এমন একটা সময় আসে যখন নাকি সমবেত শ্রম একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। জমি থেকে শস্য কাটতে হবে একটা বিশেষ ঋতুর নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে। তা হলে একাধিক লোককে এক সময়ে নিয়োজিত করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

সমবেত শক্তির শ্রম থেকে যে বেশি উৎপাদন হয় তার বহু কারণ রয়েছে। একসাথে কাজ করলে উৎপাদনের উপকরণাদি অপেক্ষাকৃত কম লাগতে পারে, সময় সংকোচন হতে পারে, একটা শ্রম-প্রক্রিয়ার ভেতরে নানান প্রকারের কাজ একই সময়ে হয় বলে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে। এই যে বর্ধিত উৎপাদন শক্তি এর মূলে শ্রমিক সমবায়। সমবায় সমাজ-শক্তিকে বিকশিত করে।

যতক্ষণ না কেউ শ্রমিকদের একত্রিত করে ততক্ষণ তারা সমবেতভাবে খাটার সুযোগ পায় না। কোন একজন পুঁজিপতিকে বহু শ্রমিকের শ্রম-শক্তিকে একত্রে কিনতে হবে। কতটুকু সে কিনতে পারবে তা নির্ভর করে তার পুঁজির পরিমাণের উপর। শুধু শ্রমশক্তি ক্রয় করার মতো পুঁজি থাকলেই চলবে না, শ্রমিককে উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হবে। সুতরাং শ্রমিক সমবায়ের জন্য পুঁজিপতির হাতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণসমূহ কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। এগুলো যে পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হবে সেই অনুপাতেই শ্রমিক সমবায়ও সংঘটিত হতে পারে। আগে আমরা দেখেছি, পুঁজির সর্বনিম্ন পরিমাণ অন্তত এতটা হওয়া চাই যেন পুঁজিপতিকে শ্রম করতে না হয়, এখন আবার আমাদের দেখতে হচ্ছে, পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র শ্রম প্রক্রিয়া যাতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে তার জন্যে একটা নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন পুঁজির পরিমাণ চাই।

বৃহদায়তনে যুক্তশ্রম পরিচালনার জন্যে এবং ব্যক্তিগত শ্রমিকদের কাজকর্ম সুসংবদ্ধ আকারে গ্রথিত করার জন্যে পরিচালকের প্রয়োজন। একজন বেহালাবাদক যখন বেহালা বাজায়, তখন সে নিজেই পরিচালক হয় নিজের, কিন্তু অর্কেস্ট্রার বেলায় তা চলতে পারে না। একজন কাউকে পরিচালনার ভার নিতেই হয়। পুঁজির একটা বিশেষ কাজ হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকের কাজ পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও তাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ। এই পরিচালনার পিছনে পুঁজিপতির উদ্দেশ্য রয়েছে অধিক থেকে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ। সর্বাধিক মাত্রার শোষণ দ্বারাই তা সম্ভবপর হতে পারে। সমবায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যতোই বাড়তে থাকে পুঁজির প্রাধান্যকে প্রতিরোধের জন্যে শ্রমিকরাও সচেষ্ট হয়, আবার পুঁজিপতিরাও প্রতিরোধকে ঘায়েল করার জন্যে উল্টো চাপ দেয়ার বন্দোবস্ত করে। শ্রম-প্রক্রিয়া সামাজিক আকার নিয়ে নির্বাহিত হয়

বলেই যে পুঁজির কর্তৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, সামাজিক শ্রম প্রক্রিয়ার ভিতরেই তা নিহিত রয়েছে ; এই কর্তৃত্ব পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বিরোধের ভিতরেই বর্তমান।

আগে আমরা দেখেছি, পুঁজিপতি কি করে ধীরে ধীরে নিজে শ্রম থেকে অব্যাহতি পেয়ে শুধুই অন্যকে খাটানোর ভার নিয়েছে। এবার আমরা দেখব, শ্রমিকের কাজ পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ—এটাও সে নিজে আর সম্পাদন করে না। বেতনভূক্ত লোক রেখে তাদের দিয়ে এই কার্যটি সম্পাদন করানো হয়।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, উৎপাদনের কর্তা ও পরিচালক বলেই পুঁজিপতি পুঁজিপতি নয়, পুঁজির মালিক বলেই সে উৎপাদনের একচ্ছত্র অধিকার ও কর্তৃত্ব পেয়েছে। মধ্যযুগে যেমন সেনাধ্যক্ষতা ও বিচার আচারের কর্তৃত্ব ছিল ভূম্যাধিকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ কাজ তেমনি এ যুগে উৎপাদনের নেতৃত্বে গ্রহণ করাও হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিপতির একটা বিশেষ ধর্ম।

শ্রমবিভাগ ও মেনুফেকচার

পুঁজিতন্ত্রের গোড়ার দিকটাকে আমরা বলি মেনুফেকচার। তখনও যন্ত্রপাতি কলকাব্জার আকার ধারণ করে নি। পুঁজিপতি শ্রম-শক্তি কিনে তা কাজে লাগায় বটে, কিন্তু শ্রমিকেরা কাজ করে হস্তশিল্পীদের মতো আগেরকার হাতিয়ার দিয়েই। সুতরাং উৎপাদনের রীতি কিছুই বদলায়নি। শ্রম-বিভাগের সূত্রে পরিচালিত সমবায় রীতি মেনুফেকচারের ভিতরেই বিকশিত হয়। মেনুফেকচার যুগটি ১৬ শতক থেকে ১৮ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

মেনুফেকচারের উদ্ভব হয় দুই প্রকারে।

১। একজন পুঁজিপতি তার কারখানায় স্বাধীন হস্তশিল্পীদের সমবেত করে। একটি জিনিস সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তাদের প্রত্যেকের হাত ঘুরে সেটিকে যেতে হবে। একটা গাড়ী তৈরি করতে হলে আগে একজন একজন করে বহু স্বাধীন হস্তশিল্পীর হাত ঘুরে যেতে হতো। মেনুফেকচারের যুগে পুঁজিপতি এই হস্তশিল্পীদের যার যার ঘরে বসে আপন আপন কাজ করতে না দিয়ে তাদের সমবেত করল তার নিজের কারখানায়। স্বাধীনভাবে যখন কাজ করত তখন শুধু গাড়ীর কাজই এইসব স্বাধীন হস্তশিল্পীরা করত না ; দর্জিকে এখন পুঁজিপতির গাড়ীর কারখানায় এসে গাড়ীসংক্রান্ত সেলাইয়ের কাজই করতে হয়। কিন্তু স্বাধীনভাবে সে যখন কাজ করত তখন অন্যান্য ধরনের সেলাই-সংক্রান্ত কাজও সে করত। এইভাবে তার কাজের পরিসর সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হলো। তা থেকেই ধীরে ধীরে মেনুফেকচার-এর শ্রম-বিভাগ গড়ে উঠল।

২। এর ঠিক উল্টোরকমেও মেনুফেকচার গড়ে ওঠে। পুঁজিপতি বাজারে শ্রমশক্তি কিনে শ্রমিককে আপন কারখানায় নিয়োগ করে। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই একই কাজই করে। সূচ তৈরি করতে গিয়ে এক একজন যে সূচের এক একটা বিভিন্ন অংশের কাজ করবে তা নয়, প্রত্যেকে তারা সূঁচ তৈরির সব কাজগুলোই করবে। কিন্তু অবস্থার চাপে এক জায়গায় একত্রীকৃত শ্রমিক শক্তির এই রকম

প্রয়োগ ও ব্যবহার না বদলে পারে না। বেশি পরিমাণ দ্রব্য নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে উৎপাদনের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। তখনই শ্রম-বিভাগ অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। একটা দ্রব্য তখন একজনের শ্রমপ্রসূত না হয়ে সমষ্টির শ্রম দিয়ে উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন শ্রমিক গোটা দ্রব্যটা প্রস্তুত না করে এর বিভিন্ন অংশ তৈরিতে ব্রতী হয়। ধীরে ধীরে এই শ্রম-বিভাগ হয়ে দাঁড়ায় একটা অতি দৃঢ় সমাজ-ব্যবস্থা।

তাহলে এক জায়গায় দেখা গেল, মেনুফেকচার বিভিন্ন স্বাধীন হস্তশিল্পীদের একত্র করে তাদের পরস্পর নির্ভরশীল করে তোলে ; এবং অন্যটিতে দেখা যায়, মেনুফেকচার উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভেতরে একটা বিশেষ সময়ে শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। গোড়ায় পুঁজিপতি কি করে তা যাই হোক না কেন, এগুলোর শেষ রূপটি একই–উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন অংশ উৎপাদনে নিয়োজিত ; সুতরাং তারা পরস্পর নির্ভরশীল।

শ্রম-বিভাগ খুব সরল অথবা খুব সুক্ষ্ম যেমনই হোক না কেন, নিম্নোক্ত সত্যটা আমরা কখনো অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারি না। উৎপাদন তখনো হস্তশিল্পের পর্যয়েই থেকে যায়। সুতরাং উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও হাতের নিপুণতার উপরে। এই রকমের উৎপাদনে হাতের কাজের স্থান খুব প্রবল বলে, এক একজন শ্রমিক এক একটি নির্দিষ্ট কাজে এমনভাবে আটকা পড়ে যায় যে, অন্য কোনো ধরনের কোনো কাজের তার আর উপযুক্ততা থাকে না।

পুঁজিপতির কারখানায় মেনুফেকচার যেভাবে শ্রম-বিভাগের প্রবর্তন করে তাতে একজন শ্রমিককে আজীবন দ্রব্যের মাত্র একটা অংশের উৎপাদনেই নিযুক্ত থাকতে হয়। এতে শ্রমিক আপন কাজে অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন করে। সমাজে শ্রম-বিভাগ খুব স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে-কেউ বা কাপড় বোনে, কেউ বা লোহার কাজ করে, কেউ কৃষিকাজ করে। মেনুফেকচার এই স্বাভাবিক শ্রম-বিভাগকেই এতো বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল করে তোলে যে কোনো একজনকে একটা দ্রব্যের সবটা তো উৎপাদন করতে হয়ই না, এমনকি একটার বেশি দুটো অংশও তৈরি করার প্রয়োজন ঘটে না। এ ধরনের আংশিক কাজই হয় একজন শ্রমিকের সরাজীবনের ব্যবসায়। একজন শ্রমিককে একটা কাজ করে অন্য একটা কাজ করতে হলে বারবার তাকে স্থান পরিবর্তন করতে হয়, হাতিয়ার বদল করতে হয়– এতে সময় নষ্ট হয় খুব বেশি। কিন্তু একজনকে যদি একটা কাজই এক জায়গায় বসে করতে হয়, সময়-সংক্ষেপ তো হবেই, তা ছাড়া কার্যদক্ষতা ও কাজের প্রতি নিবিষ্টতাও দেখা দেবে অনেক বেশি। ফলে উৎপাদনের মাত্রা এতে অনেকখানি বেড়ে যায়। অন্যদিকে, বারবার একই কাজ করার ভেতর বিরক্ত উৎপাদন ও একঘেয়ে ভাবের সৃষ্টি হয় বেশি; এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যাবার সুযোগ থাকলে আত্মবিনোদনের সম্ভাবনা থাকে।

উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি শ্রমিকের ক্ষমতা থেকেই শুধু হয় না, হাতিয়ার গুলোও উপযুক্ত হওয়া চাই। একই হাতিয়ার হয়তো বা একই শ্রম-প্রক্রিয়ার পাঁচরকম কাজে লাগে। কিন্তু শ্রম-বিভাগের সাথে সাথে হাতিয়ারগুলোকে সবরকমের কাজে নিযুক্ত না করে, একটা বিশিষ্ট কাজে ব্যাপৃত করাই প্রয়োজন হয়ে ওঠে। মেনুফেকচারের যুগে দ্রব্য উৎপাদনের যাবতীয় বিভাগের উপযোগী হাতিয়ার তৈরি হয়ে সেগুলোর

সংখ্যা ও রকম বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাটা থেকেই ধীরে ধীরে কলকব্জার সৃষ্টি হবে ; কলকব্জা মেনুফেকচার যুগের সরল হাতিয়ার-পাতির সমবায় মাত্র।

মেনুফেকচারের মূলকথা হলো, খন্ড খন্ড কাজের জন্য আলাদা আলাদা শ্রমিক নিয়োগ এবং তাদের কার্যোপযোগী আলাদা আলাদা হাতিয়ারের ব্যবস্থা।

মেনুফেকচারের দু'টো মৌলিক রূপ আছে (১) পৃথকীকৃত (Heterogeneous) মেনুফেকচার, (২) ক্রমানুসারী (Serial) মেনুফেকচার। এমন কতোগুলো দ্রব্য আছে, যার বিভিন্ন অংশগুলো পৃথক পৃথকভাবে উৎপাদিত হয় ; এদের একত্র করে তবে দ্রব্যের গোটা চেহারাটা আমরা পাই। এধরনের দ্রব্য উৎপাদন সম্পন্ন হয় যান্ত্রিক উপায়ে। নুরেমবুর্গের হস্তশিল্পীদের তৈরি ঘড়ি পরবর্তী মেনুফেকচার যুগে আর একজনের উৎপাদিত দ্রব্য হয়ে থাকল না, ঘড়ি তখন বহু লোকের বিভিন্ন কাজের ফলস্বরূপ তৈরি হতে লাগল। এক একজন শ্রমিক এক একটি অংশ তৈরি করার পর, সর্বশেষের শ্রমিক এগুলো একত্রিত করে ঘড়ি তৈরি করে। এই বিভিন্ন অংশগুলোকে জোড়া দেয়ার আগে তাদের ভিতরে কোনো সম্বন্ধ ছিলো না—এগুলো সব আলাদা আলাদা তৈরি হয়েছে। ক্রমানুসারী মেনুফেকচার আবার অন্যরকম, এটি মেনুফেকচারের বিকশিত রূপ। একটা দ্রব্য সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তাকে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে, তবে শেষ রূপটি নিতে হয়। কাঁচামাল থেকে শুরু করে দ্রব্য-রূপটা পর্যন্ত একটা পরস্পরগত সম্পর্কে স্তরগুলো সংগ্রথিত। একজন শ্রমিক থেকে একটা রূপ নিয়ে কাঁচামাল অন্য শ্রমিকের হাতে অন্য রূপ নেয়, এইভাবে হয়ত বা পাঁচটা স্তরের ভিতর দিয়ে গেলে তবে তার সম্পূর্ণ এবং শেষ রূপটা লাভ হয়। সমষ্টিগত শ্রমিক বহু হস্ত-সমন্বিত এবং বহু হাতিয়ার-যুক্ত বলেই এ ধরনের উৎপাদনে এক সময়ে ও একসাথে বহু প্রকারের কাজ সম্পন্ন হতে দেখা যাচ্ছে। ক্রমানুসারী মেনুফেকচারে একজনের বিশেষ ধরণের শ্রম যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকে শুরু হয় অন্য একজনের ভিন্ন প্রকারের শ্রম।

একজনের কাজ নির্ভর করে আর একজনের কাজের উপর। প্রথম শ্রমিক যে কাজটা করেছিলো তা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে সম্পন্ন করতে হয় তা হলে ২ জন শ্রমিকের হয়তবা প্রয়োজন হবে। শ্রম বিভাগ যতো সুক্ষ্ম হবে, ততই বিশেষ করে প্রয়োজন হবে বিভিন্ন স্তরগুলোর ভেতর উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগ। শ্রম-বিভাগ প্রক্রিয়া দ্বারা যতো বেশি কর্মের গুণগত প্রভেদ সৃষ্টি হবে, ততই বিভিন্ন স্তরগুলোর ভেতর সংখ্যার অনুপাত স্থির করা দরকার হবে।

মেনুফেকচার যুগে দ্রব্যবিশেষের উৎপাদনে দেখা যায়, তার বিশেষ একটা স্তরের কাজ এতো শক্ত যে তাতে সাধারণ হাতিয়ার চলে না, সেখানে প্রয়োজন হয় কলের। মেনুফেকচারের ভিতরে হাতের কাজই প্রবল হলেও সেই যুগে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের উদ্ভব দেখতে পাই। কম্পাস, টাইপ প্রিন্টিং, অটোমেটিক ক্লক প্রভৃতির আবিষ্কার মেনুফেকচারের যুগেই হয়েছে। এগুলোর ব্যবহার তখনও সুনিয়ন্ত্রিত রীতিতে সার্বত্রিক হয়ে ওঠে নি।

মেনুফেকচারে যে শ্রম-বিভাগ হলো তার ফল-স্বরূপ দেখা গেল যে, শ্রমিকেরা মাত্র একটা বিশেষ রকমের কাজই করে, দ্রব্যের একটা অংশ মাত্র প্রস্তুত করে,

সমগ্র দ্রব্যটার উৎপাদনে ব্যক্তিগত শ্রমিকের কোনো হাত নেই। সমগ্র দ্রব্যটা প্রস্তুত করার অধিকার সমষ্টিগত শ্রমিকের। সুতরাং শ্রমিকের কর্মদক্ষতা সীমাবদ্ধ হয় একটা ক্ষুদ্র জিনিসের ভেতর। তাই তার কর্মদক্ষতাকে সম্পূর্ণরূপে স্ফূরিত ও বিকশিত করার সুযোগ সে হারায়। এইভাবে শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব খর্বিত হয়। শুধু তাই নয়, শ্রম-বিভাগ হলেও শ্রমেরও রকমভেদ আছে; জটিল এবং সরল, উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের শ্রম রয়েছে। এই ভেদানুসারে, বেশি বেতনের ও কম বেতনের শ্রমিকের দল দেখা দিল।

উৎপাদনের ভিতর যে শ্রমবিভাগ আমরা দেখলাম, তার মূলে রয়েছে সমাজের ভিতরের শ্রমবিভাগ। প্রথমত গোষ্ঠীর ভেতরে, তারপর পরিবারে পুরুষ-মেয়ে বিভেদ এবং বয়সের তারতম্যের উপরে শ্রম-বিভাগ আত্মপ্রকাশ করে। আমরা আগেই বলেছি, প্রথম বিনিময় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হয়নি, সর্বপ্রথম তা সংগঠিত হয়েছিল গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে; কেননা সভ্যতার প্রথমযুগে ব্যক্তি গোষ্ঠী দ্বারা আচ্ছন্ন থাকত। বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতর বিভিন্ন রকমের উৎপাদনে যেতো, তাদের উৎপাদনের এবং জীবনধারণের উপকরণ তৈরির জন্য। তাই তাদের উৎপাদনের প্রণালী, জীবনের রীতি এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিভিন্ন রকমের। এই বিভেদটুকু আছে বলেই বিনিময় অবশ্যম্ভাবী। বিনিময় কখনো শ্রম-বিভাগের কারণ নয়; প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে শ্রম-বিভাগ স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদনের গোড়ার কথা, দ্রব্যের পণ্যে পরিণতি এবং বাজারে সেগুলোর চলাচল। সুতরাং মেনুফেকচার-এ শ্রম-বিভাগের জন্যে প্রয়োজন সমাজে শ্রম বিভাগের বিশেষ মাত্রায় বিকাশ। আবার উল্টো দেখা যায়, মেনুফেকচারে শ্রম-বিভাগ সৃষ্টি হয়। একটা উৎপাদনের জন্যে তিন প্রকার জিনিসই হয়তবা এক স্থানে উৎপাদিত হয়। কিন্তু বেশি উৎপন্নের জন্যে শ্রম-বিভাগ যতোই সূক্ষ্ম হতে লাগল, ততই দুই প্রকার জিনিসের উৎপাদন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদিত হতে শুরু করল; এতে সমাজে শ্রম-বিভাগ আগের থেকে বেশি বাড়ল।

উৎপাদনে শ্রম-বিভাগ এবং সমাজে শ্রম-বিভাগ এই দুয়ের ভেতরে কয়েকটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। কারখানায় শ্রম-বিভাগ হতে হলে একজন পুঁজিপতির হাতে উৎপাদনের উপকরণাদি কেন্দ্রীভূত হওয়া চাই, কিন্তু সমাজে শ্রম-বিভাগ হতে হলে বহু স্বাধীন উৎপাদনকর্তার হাতে পুঁজিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা চাই। কারখানায় দেখা যায়, তার একটা বিভাগে যে পরিমাণ লোক নিয়োগ করা হলো, ঠিক সেই অনুপাতে অন্যান্য বিভাগেও লোক নিয়োগ করা চাই। কিন্তু কারখানার বাইরে সমাজে দেখা যায় যে, বিভিন্ন উৎপাদনে লোক নিয়োগ করা হয় নিতান্তই বিশৃঙ্খলভাবে। একটা উৎপাদনে হয়ত বা একটু বেশি মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে, অমনি অন্যান্য উৎপাদন থেকে লোক ও পুঁজি উঠিয়ে এনে তাতে নিযুক্ত করা হবে। অবশ্য বিভিন্ন উৎপাদনে যে পরিমাণ পুঁজি খাটানো দরকার তার ভেতর একটা সামঞ্জস্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু এই সামঞ্জস্য আসে বারবার অসামঞ্জস্য ও সংকটের ভেতর দিয়ে।

বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের একটা অদ্ভূত মনোভাব এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সমাজের ক্ষেত্রে তারা চায় প্রতিযোগিতা; এই প্রতিযোগিতা খর্ব করার জন্যে যদি সমাজ কখনো হস্তক্ষেপ করে, তাহলে পুঁজিপতিরা খড়গহস্ত হয়ে দাঁড়ায়। সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের পরিচালনা এবং বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন উৎপাদনে লোক নিয়োগ কখনো তাদের মনোঃপুত হতে পারে না। অথচ দেখা যায়, নিজেদের কারখানার ভেতর তারাই আবার এই নীতি অনুসরণ করে। সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর উদ্ভাবন করে, শ্রমিকদের সকল অধিকারে বাধা জন্মিয়ে পুঁজিপতিরা উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব তারা উপেক্ষা করে, কিন্তু কারখানায় তাদের নিজেদের কর্তৃত্ব থাকা চাই সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন। লক্ষ্য করার বিষয়, সমাজে উৎপাদনের ভিতর প্রতিযোগিতামূলক অরাজকতা যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারখানায় শ্রমিকের উপর পুঁজিপতির স্বেচ্ছাচারমূলক কর্তৃত্ব ততই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুরনো উৎপাদন প্রণালীগুলোর ভেতর আমরা দেখতে পাই যে, তখন উৎপাদনের উপর সমাজের কর্তৃত্ব ছিলো বেশি; কিন্তু বেশি ছিলো বলেই শ্রম বিভাগ খুব সূক্ষ্ম হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। জাত (Cast) এবং গিল্ডের উপরে সমাজের খুব কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিলো বলেই তাদের ভিতর শ্রমবিভাগ-এর একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল; গিল্ড এবং জাতের ভিতরে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করার রীতি ছিল না। সুতরাং স্বয়ং মালিককেও তখন খাটতে হতো। এই অবস্থায় শ্রমবিভাগ কখনো জটিল ও সূক্ষ্ম হতে পারে না।

মেশিন ও আধুনিক শিল্পোৎপাদন

উৎপাদনে শ্রম-বিভাগের রীতি প্রবর্তন করে মেনুফেকচার শ্রমিককে অনেকখানি পুঁজির বশবর্তী করেছে এবং শ্রমিককে দ্রব্যের মাত্র একটা অংশ উৎপাদনে নিযুক্ত করে তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করেছে, কিন্তু উৎপাদনের রীতি অর্থাৎ যন্ত্রপাতির চেহারা বদলাতে পারে নি বলে মেনুফেকচারকে হাতের কাজের উপরই নির্ভর করতে হতো; যতক্ষণ হাতের কাজই উৎপাদনে প্রবল চিল, ততক্ষণ শ্রমিক তার খেয়াল ও ইচ্ছাকে খানিকটা হলেও খাটাবার সুযোগ পেত। এ কারণেই পুঁজিপতির পক্ষে শ্রমিককে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা তখনও সম্ভব হয়নি। ঘোড়ারও ইচ্ছা অভিপ্রায় আছে, ছুটতে ছুটতে সে হঠাৎ থেমে যায়। শ্রমিক তো মানুষ, তার যখন একটা মস্তিষ্ক আছে, মাঝে মাঝে যে সে নিজের মাথা খাটিয়ে পুঁজিপতির ইচ্ছা বিরুদ্ধ কাজ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু মুনাফা অর্জন ও তা বৃদ্ধির জন্য এটা মস্ত একটা অন্তরায়। তাই কারখানায় নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনতে পুঁজিপতি উঠে পড়ে লাগে; নিয়ম প্রবর্তন করলেন আর্করাইট; মেশিনের আবিষ্কার হলো।

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, এতো যে যান্ত্রিক আবিষ্কার হচ্ছে, তা মানুষের শ্রমকে লাঘব করতে পারছে কিনা তা সন্দেহজনক। মেশিনারীর পুঁজিতান্ত্রিক প্রয়োগের উদ্দেশ্য কখনো সেটা হতেই পারে না। এর আসল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকের অবশ্য শ্রম-সময় কমিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ানো।

মেনুফেকচারের আগের উৎপাদন প্রণালী হতে পার্থক্য ঘটল এখানে যে, অনেক শ্রমিকের শ্রম শক্তি পণ্য হিসাবে বিক্রি হয়ে তা একজন পুঁজিপতির অধীনে খাটানো হতে লাগল। বর্তমানের উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটল উৎপাদনের যন্ত্রপাতির রূপান্তরে। তাহলে প্রথমেই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হবে উৎপাদনের যন্ত্র হাতিয়ার (Tools) হতে কি করে মেশিনে পরিবর্তিত হলো। হস্তশিল্পের যন্ত্র কি বর্তমান কলকব্জার জন্ম দিল।

কেউ কেউ বলেন, সরল মেশিনই হাতিয়ার, আর জটিল হাতিয়ার মেশিন। তারা দুটির মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য দেখেন না। অর্থনৈতিক বিচারের দিক থেকে এরকম ব্যাখ্যা মোটেও কার্যকরী হতে পারে না। এর ভেতর ঐতিহাসিক মাল মসলা ও উপাদান বড়ো একটা নেই। কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, হাতিয়ারকে চালায় মানুষের শক্তি; মেশিনের পশ্চাতে পরিচালন শক্তি মানুষের নয়, অন্য কিছুর, যেমন জন্তু, জল, বাতাস ইত্যাদি। এই বক্তব্য অনুযায়ী ষাড় যখন লাঙ্গল টানে তখন লাঙ্গল নিশ্চয়ই মেশিন। জন্তুর সাহায্যে যন্ত্র চালানো অনেক প্রাচীনকালেই উদ্ভাবিত, তাই বলে কি সেই সময় থেকেই মেশিনের প্রচলন ছিল?

পূর্ণ বিকশিত মেশিনারীর তিনটে অংশ; প্রথম প্রেরক-যন্ত্র (Motor-mechanism); দ্বিতীয় বাহন যন্ত্র (Transmitting); তৃতীয় হাতিয়ার বা কাজ করার যন্ত্র (Working tool) প্রেরক যন্ত্রই সব মেশিনারীগুলোকে সক্রিয় করে তোলে। স্টিম, ইলেকট্রিসিটি, জল, বাতাস এগুলো দিয়ে প্রেরক শক্তিটা কার্যকরী হতে পারে। ফ্লাই হুইল, পুলি, দড়ি-দড়া প্রভৃতিই সাধারণত বাহন যন্ত্রের কাজ করে থাকে। মেশিনারীর কাজ করার অংশ সর্বপ্রথম রূপান্তরিত হয়ে উৎপাদনে বিপ্লব এনে দিল, শিল্প বিপ্লবের প্রবর্তন করল। এই কাজ করার মেশিনই যে সব হাতিয়ার হস্তশিল্পে ব্যবহৃত হতো তাদের সমবায়। এই হাতিয়ারগুলো মানুষ আর আগের মতো প্রত্যক্ষভাবে চালায় না, কেননা এগুলো এখন একটা বৃহৎ মেশিনের অংশ হিসাবেই দেখা দেয়। তখন থেকে এরা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের হস্তচালিত হাতিয়াররূপে দেখা দেয় না। সরাসরি সূচ দিয়ে মোজা তৈরি না করে একাধিক সূচকে স্টকিং লুমের ভেতরে সন্নিবিষ্ট করে লুমটাতে চালনা শক্তি আরোপ করা হয়। ছুরি দিয়ে প্রত্যক্ষত কাজ না করে একাধিক ছুরিকে চপিং মেশিনের ভেতর সন্নিবিষ্ট করে তবে মাংস কাটার আয়োজন করা হয়। যে দেহটার ভেতর হস্তশিল্পযুগের হাতিয়ার ইত্যাদিকে সন্নিবিষ্ট করে কাজ করানো হয়, সেই দেহটার আবিষ্কার থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের শুরু গণনা করা যেতে পারে। প্রকৃত মেশিন দিয়ে তাহলে পূর্বযুগের হাতিয়ারগুলোকেই মাত্র কাজ করানো হয়; আগে মানুষ হাতিয়ারগুলোকে দিয়ে সরাসরি কাজ করাত, এখন এগুলোকে পরোক্ষভাবে মেশিনের সাহায্যে কাজ করানো হয়। চালনা শক্তি যে উপায়েই প্রয়োগ করা হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। পূর্বযুগের সাথে পার্থক্য তৈরি হয় হাতিয়ারের ব্যবহারের যে তারতম্য ঘটল তা দিয়ে। মানুষকেই যদি হাতিয়ার চালাতে হয়, তাহলে সে কতোগুলো হাতিয়ারকে একসঙ্গে চালাতে পারে? মানুষের হাতের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। একহাতে একটার বেশি

হাতিয়ার চালানো সম্ভব না, দুই হাতও যদি সমানভাবে চালানো সম্ভব হয় তা হলেও বড়জোর দুটো হাতিয়ার একসঙ্গে সে চালাতে পারে। মেশিনে হাতিয়ার ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা বেশিসংখ্যক হাতিয়ারকে একসাথে কাজে লাগাতে পারি।

মেশিন যতোই বৃহদাকার হতে লাগল, মানুষের পক্ষে মেশিনে শক্তি চালনা দুরূহ হয়ে পড়ল। প্রথম ঘোড়া, তারপর বাতাস, জল এই সব প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করে মেশিন চালানোর ব্যবস্থা হলো। অবশেষে দেখা দিল ওয়াট আবিষ্কৃত স্টিম ইঞ্জিন। এই স্টিম ইঞ্জিনের উপযোগিতা কোন একটা বিশেষ মেশিন চালানোয়ই প্রকাশ হয় না, সব রকম মেশিন চালানোর অর্থাৎ সব যান্ত্রিক উৎপাদনেই স্টিম ইঞ্জিন শক্তি সঞ্চারণের কাজ করতে পারে।

মেশিনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হওয়ায় শ্রমিকদের উৎপাদন শক্তি যেমন বেড়েছে তেমনি শ্রমিককেও পুরোপুরি আটকে রাখা হয়েছে মেশিনের কাছে। শ্রমিকের উপর আধিপত্য এখন পুরো প্রতিষ্ঠিত হলো। মেশিনের প্রয়োগ করতে গিয়ে এই হিসাবটা আমাদের দেখতে হয়, এর প্রয়োগে যে পরিমাণ শ্রম বাঁচল, মেশিন তৈরি করতে তার চেয়ে কম শ্রম লাগল কি-না। কিন্তু পুঁজিপতির হিসেব আবদ্ধ থাকে আরও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে। শ্রমিক যতোটা মূল্য উৎপাদন করেছে পুঁজিপতি ততোটা দিতে পারে না, সে দেয় শ্রম-শক্তির মূল্য। সুতরাং যে সব শ্রমিকের জায়গায় মেশিনকে স্থাপন করা হয় তাদের শ্রম শক্তির মূল্য থেকে যদি মেশিনের মূল্য কম হয় তবেই পুঁজিপতি মেশিন প্রয়োগ করবে। যে পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয় এবং তা থেকে যে পরিমাণ মূল্য উৎপাদিত হয় পুঁজিপতি মেশিনের মূল্যকে তার সাথে তুলনা করে, তুলনা না করে শ্রম-শক্তির মূল্যের সাথে। যে মূল্য শ্রমিক উৎপাদন করে তা থেকে শ্রম-শক্তির মূল্য কম। এবং এরই সাথে তুলনা করা হয় বলে পুঁজিপতির পক্ষে মেশিনের বিস্তারিত প্রয়োগ সম্ভব হয় না। কিন্তু সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় মেশিনের প্রয়োগ হবে আরো ব্যাপক, কেননা তখন হিসাব করে দেখা হবে যে সব শ্রমিকের পরিবর্তে মেশিনকে স্থাপন করা হবে, তারা যে পরিমাণ শ্রম দিয়ে মোট মূল্য উৎপাদন করে, তা থেকে মেশিনের মূল্য কম কি না। এখন দেখা যায় যে, ইংল্যাণ্ডের একটা মেশিন ইংল্যাণ্ডে আবিষ্কৃত হলো বটে, কিন্তু সেখানে তার প্রয়োগ না হয়ে হয়ত বা তাকে রপ্তানি করা হলো আমেরিকায়। ইংল্যাণ্ডে কতগুলো উৎপাদনে মেশিন প্রয়োগ করায় অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে; তাই সেখানে শ্রমিকের মজুরি তার প্রকৃত শ্রম শক্তির মূল্যের নিচে নেমে আসে; ফলে ইংল্যাণ্ডের পুঁজিপতি হিসাব করে দেখবে মজুরি যখন এদেশে কম তখন মেশিনের পরিবর্তে মানুষকেই খাটানো যাক। যে দেশে মজুরি বেশি সেখানেই মেশিন কাজ করবে। মেশিন তৈরির জন্য যে প্রয়োজন তা হয়ত বা ঠিকই আছে; কিন্তু মেশিন তৈরিতে যেসব শ্রমিক ব্যবহার করা হবে, কোনো কারণে হয়তোবা তাদের মজুরি তাদের শ্রম-শক্তির মূল্য অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে; এই অবস্থায় মেশিনের বাজারদর বেড়ে যাবে। পুঁজিপতি তখন মেশিন প্রয়োগ না করে শ্রমিক নিয়োগ করাটাই শ্রেয় মনে করবে। সমাজতন্ত্রে এ ধরনের হিসাব ও বিচারের স্থান নেই। কেননা শ্রমশক্তির মূল্য

বলে কোন জিনিস তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় থাকতে পারে না। গত শতাব্দীতে দেখা গেছে, ইংল্যাণ্ড যান্ত্রিক আবিষ্কারের জন্মভূমি হলেও যন্ত্রের প্রয়োগ সেখানে ব্যাপকভাবে চলতে পারত না; সস্তায় মজুরের শ্রম-শক্তি কিনে তা যথেচ্ছ প্রয়োগ করে নিরর্থক ও নিতান্ত অমানুষিকভাবে শ্রম-শক্তির অপব্যবহার করা হয়। এই অপব্যবহার একমাত্র রোধ হতে পারে সাম্যবাদী সমাজে।

মেশিনের প্রবর্তন হওয়ায় এখন আর শারীরিক শক্তির তেমন প্রয়োজন থাকল না। কেবলমাত্র পূর্ণ বয়স্ক সবল শ্রমিকদের দিয়েই কাজ করানো হবে–এ অবস্থাটা উল্টে গেল। মেশিন প্রকৃতপক্ষে শ্রম কমাবে, কিন্তু এর ব্যবহার শুরু হওয়া মাত্র মেশিন সবরকম মানুষকেই পুঁজিপতির পদানত করল। পরিবারে আর কেউ বাদ থাকল না-স্ত্রী, পুরুষ, শিশু-সবাই মেশিনের চাহিদা মেটাতে ছুটে আসল।

শ্রম-শক্তির মূল্য শুধু পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের আপন জীবন-ধারণের উপযোগী উপকরণের মূল্য দিয়েই নির্ধারিত হয় না, তার সমস্ত পরিবারটার খেয়ে পরে বাঁচার জন্য যা প্রয়োজন, পুঁজিপতির কাছ থেকে শ্রমিকের তাই প্রাপ্য। কিন্তু মেশিন গোটা পরিবারটাকে পরিবারের গণ্ডী থেকে বের করে আনায়, এখন স্ত্রী ও শিশুকেও যখন কিছু দিতে হয়, তখন পুরুষকে সম্পূর্ণ মূল্য না দিলেও চলে। চারজনের একটা পরিবারকে এখন মোট যা দিতে হবে, তা হয়ত আগে পূর্ণবয়স্ক একজনকে যা দিতে হতো তার চেয়ে সামান্য বেশি; কিন্তু পুঁজিপতি এখন চারজনকে খাটিয়ে অনেক বেশি শ্রম আদায় করে নিতে পারে। মেশিন চলতি ব্যবস্থাকে অনেকভাবেই বদলে দিয়েছে; পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের ভেতরের চুক্তি সম্বন্ধটাও রূপান্তরিত করে দিয়েছে। আমরা আগেই দেখিয়েছি পুঁজিপতি এবং শ্রমিক পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল স্বাধীন মালিক হিসেবে-একজন মুদ্রার মালিক, অন্যজন শ্রমি-শক্তির পণ্যের অধিকারী। আগে শ্রমিক তার আপন শ্রম-শক্তিই বিক্রয় করত, এখন সে তার স্ত্রী এবং সন্তানদেরও সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে। সুতরাং শ্রমিক এখন হয়ে দাঁড়াল দাস ব্যবসায়ী।

মেনুফেকচারের যুগে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকেরা পুঁজিপতির স্বেচ্ছাচারিতাকে যতোটা রুখতে পারত, এখন আর তাদের সে ক্ষমতা থাকল না। স্ত্রী এবং শিশুরা যতো বেশি উৎপাদনে ঢুকতে শুরু করেছে, ততোই পুঁজিপতির স্বৈরাচারকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শ্রমিকেরা হারিয়ে ফেলেছে।

পুঁজিপতি শ্রমদিবসকে যতো ঘণ্টা সম্ভব বাড়াতে চায়। এতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা উপশমের জন্য রাষ্ট্র শ্রমদিবসকে আইন-কানুন প্রণয়ন করে সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হয়। তখন থেকেই একটা নতুন ঘটনা বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমদিবসের ইচ্ছামতো বিস্তার যখন বন্ধ করে দেয়া হলো, মনিব তার মুনাফার মাত্রা ঠিক রাখার জন্য অন্য কৌশলের আশ্রয় নিল, সীমাবদ্ধ সময় বলেই এখন শ্রমকে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রখর করে তুলতে হবে।

মেশিন চালানোয় শ্রমিক যতোই অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তার হাত যে ততো বেশি তাড়াতাড়ি চলবে তাতে সন্দেহ নেই; আগে হয়তবা একটা মেশিনকে সে এক

মিনিটে একবারই ঘুরাতে পারত, এখন এক মিনিটে পারে দেড় পাক। এই ফলাফলটা স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। কিন্তু যাই হোক, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, যেখানে একই কাজ সমানভাবে, একঘেয়ে রকমে দিনের পর দিন চলছে, সেখানে শ্রমের সময় বাড়াতে গেলে শ্রমের প্রখরতা অবশ্যই কমবে, আবার সময় কমালে শ্রমের প্রখরতা বাড়বে। শ্রমিকদের বিদ্রোহভাব প্রকাশ হওয়ায় পার্লামেন্ট বাধ্যতামূলক আইন করে শ্রম সময় নির্দিষ্ট করে দিল। পুঁজিপতি তখন মেশিনের উৎকর্ষ সাধন করে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের স্বরূপের ভেতরও পরিবর্তন দেখা দিল। সাধারণত আমরা জানি, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করা হয় শ্রমিকের উৎপাদন-শক্তিকে বাড়িয়ে, যেন একই সময়ে একই শ্রমের মাত্রা দ্বারা সে বেশি উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। বাধ্যতামূলক আইনের মাধ্যমে শ্রমদিবসকে সংক্ষিপ্ত করলে একটা অন্যরকমের ঘটনা সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট শ্রম দিবসটা যাতে পুরো মাত্রায় সদ্ব্যবহার করা যায় তা দেখাই এখন হয়ে ওঠে পুঁজিপতির লক্ষ্য। বিন্দুমাত্রও তাতে ফাঁক থাকতে পারবে না, শ্রমিক বিন্দুমাত্র অবসর খুঁজতে পারবে না-সুতরাং আগেকার এক ঘণ্টা হতে এখনকার এক ঘণ্টার শ্রমের খরচ হয় অনেক বেশি; কাজে কাজেই আগে এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ উৎপাদন হতো, এখন তা থেকে বেশি হবে। বেশি পরিমাণ শ্রম এখন ঘনীভূত হল একই সময়ের ভিতর। সুতরাং এখনকার একঘণ্টা আগের হয়তবা বা দেড় ঘন্টার সমান। উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য তো বাড়বেই, তা ছাড়া শ্রমের প্রখরতার জন্যেও অবশ্য শ্রমদিবসের সময় কমে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের মাত্রা বাড়বে। শ্রমিকের গাঢ়তা কি করে বাড়ে এখন আমরা সেই প্রশ্নেই আসব।

শ্রমদিবসকে সংক্ষিপ্ত করলে, শ্রমিক অল্প সময়ে বেশি কাজ দিতে পারে, তাতে অল্প সময়ে বেশি শ্রম ঘনীভূত হয়। শ্রমদিবসকে ছোট করা যখন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়, তখন পুঁজি ভাল ভাল মেশিনের সাহায্যে শ্রমিকের কাছ থেকে বেশি শ্রম নিঙড়ে নিতে সচেষ্ট হয়। মেশিনের সাহায্য নেয়া হয় দুইভাবে– (১) মেশিনের গতি দ্রুত করা। (২) শ্রমিকের কাজের জন্য আগের চেয়ে বেশি মেশিন দেয়া। মেশিনের উৎকর্ষতা প্রয়োজন, কেননা তা না হলে শ্রমিকের উপর ভালভাবে চাপ দেয়া সম্ভব হয় না; তাছাড়া খরচ সংকোচন করতে হলেও এই উৎকর্ষের আবশ্যকতা আছে। স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার শুধু যে পিস্টনের গতি বাড়িয়েছে তাই নয়, এর সাহায্যে কম কয়লা খরচে বেশি মেশিন চালানও সম্ভবপর হয়েছে।

হস্তশিল্প ও মেনুফেকচার যুগে শ্রমিক হাতিয়ারের সাহায্যে কাজ করে, কিন্তু ফ্যাক্টরীতে মেশিন শ্রমিককে কাজ করায়। প্রথমটায় কি করে কাজ করতে হবে না না হবে তার পরিকল্পনাদি করে শ্রমিক নিজেই। কিন্তু ফ্যাক্টরীতে সব সময়ই শ্রমিককে মেশিনের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। মেনুফেকচারে শ্রমিক একটা জীবন্ত উৎপাদন ব্যাপারের অংশবিশেষ, কিন্তু ফ্যাক্টরীতে রয়েছে একটা জীবনহীন যান্ত্রিক ব্যাপার; শ্রমিক এটার উপর একটা জীবন্ত গলগ্রহ মাত্র। যে কোনো পুঁজিবাদী উৎপাদন, যার উদ্দেশ্য উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ—মেশিনকে প্রয়োগ করে শ্রমিকের শ্রমকে

সদ্ব্যবহার করার জন্য; মেশিন হলো কর্তা, শ্রমিক মেশিনের দাস মাত্র। পুঁজিবাদী বর্তমান উৎপাদন প্রণালীতে শ্রম এবং মস্তিষ্কের ভেতর সম্পূর্ণ ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল। শ্রমিকের পক্ষে এখন আর নিজের মস্তিষ্ক খাটানো অথবা প্রবর্তন শক্তি প্রয়োগের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন থাকল না, তারা শুধুই শ্রমের অধিকারী। মস্তিষ্কের অধিকার একচেটিয়া হয়ে গেল পুঁজিপতির। পুঁজিপতি তার আপন মস্তিষ্ক থেকে একটা ফ্যাক্টরী কোড (Factory-code) সৃষ্টি করবে। শ্রমিককে শায়েস্তা করার জন্য পুঁজিপতির প্রণীত শাস্তির ফিরিস্তি ভারী চমৎকার; ফ্যাক্টরী লাইকার গ্যাসএমনভাবে সব বিষয়ের ব্যবস্থা করে যে শ্রমিক কখনো কখনো কাজ না করলে অথবা ফ্যাক্টরীতে যেতে দেরী করলে ফাইন-স্বরূপ সে যা আদায় করে তার পরিমাণ মুনাফার চেয়ে বেশি হয়। ফ্যাক্টরীর মধ্যে যে অবস্থায় শ্রমিককে কাজ করতে হয়, সে সম্বন্ধে বলা চলে যে, যে পরিমাণ আলো বাতাস ও দাঁড়ানোর জায়গা শ্রমিকের প্রয়োজন তা পুঁজিপতি যতো বেশি সংকুচিত করতে পারবে ততই তার মুনাফা বাড়তে পারে। শ্রমিকের কাজের জন্য আলো, বাতাস ও দাঁড়ানোর স্থানের পরিমাণ চুরি করতে পারাটাই হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিপতির লক্ষ্য।

পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বিরোধ প্রথম থেকেই লেগেছে। কিন্তু উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে তার বিরোধ শুরু হয়েছে মেশিনের আবিষ্কার ও প্রবর্তনের সময় থেকে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক কখনো 'মেশিন উৎপাদন প্রণালীর ভিত্তি হোক' এটা চাইতে পারে না। ১৭ শতাব্দীতে প্রায় সারা ইউরোপে রিবণ লুমের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করেছিল। ১৬৮৫ খৃস্টাব্দে জার্মানীতে রাষ্ট্রের নিষেধে এই লুমটির প্রচলন ও ব্যবহার একেবারেই বন্ধ করে দেয়া হলো। এভারেট ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম পশম কাটার মেশিন প্রস্তুত করলে এক লক্ষ লোক এক হয়ে সেটা পুড়িয়ে দেয়। আর্করাইটের আবিষ্কারের বিরুদ্ধে ৫০ হাজার লোক একত্র হয়ে পার্লামেন্টে দরখাস্ত পেশ করে। উনবিংশ শতকের প্রথম পনের বছর ইংল্যাণ্ডে মেনুফেকচারগুলোতে পাওয়ার লুম প্রবর্তন করায় সেখানে লুডাইট মুভমেন্ট নামে মেশিন ভাঙ্গার একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয়; সিউমাউথ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়াশীল এন্টি জেকোবিন গর্ভর্মেন্টগুলো এর সুযোগ নিয়ে নৃশংসভাবে অত্যাচার করতে ছাড়ে নি। শ্রমিকদের কাছে প্রথম দিকে মনে হতো মেশিনই বুঝি তাদের শত্রু, কেননা মেশিনের প্রবর্তন করলেই কতগুলো শ্রমিক কাজ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে যেমন তাদের অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল, ততই তারা বুঝতে পারল মেশিন প্রকৃতপক্ষে তাদের শত্রু না, মেশিনের পুঁজিবাদী প্রয়োগই তাদের কর্মহীনতার কারণ। তখন থেকে তারা সংগঠিত হতে লাগল অন্যভাবে, মেশিন ভাঙ্গা নয়, পুঁজিবাদের উচ্ছেদের মাধ্যমেই কেবল তাদের মুক্তি সম্ভব।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বলে থাকেন, মেশিনের প্রয়োগে যে সব শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়, তাদের পুনরায় নিয়োগের জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তাও সাথে সাথে বের হয়ে আসে। সুতরাং শ্রমিকের বেকার হওয়ার কথা উঠতেই পারে না। খালি শ্রমিকই যে কর্মচ্যুত হয় তা নয়, তাদের পুনরায় নিয়োগ করার মতো পুঁজিও খালাস হয়।

ধরা যাক, একটা কার্পেট ফ্যাক্টরীতে ১০০ শ্রমিক কাজ কর। তাদের বার্ষিক মজুরি প্রতি জনের ৩০ পাউন্ড; সুতরাং বছরে পুঁজিপতির খরচ করতে হয় ৩ হাজার পাউন্ডের পরিবর্তমান পুঁজি। এখন সে ৫০ জন মজুরকে কাজ থেকে ছেড়ে দিয়ে ১৫০০ পাউন্ড মেশিনে খরচ করল, কাঁচামালের দাম আগে যেমন ৩ হাজার পাউন্ড ছিলো, তাই থাকল। এই পরিবর্তনের আগে মোট ৬ হাজার পাউন্ডের মধ্যে ৩ হাজার পাউন্ড ছিল অপরিবর্তমান অংশ, আর বাকী ৩ হাজার পরিবর্তমান অংশ। পরিবর্তনের পর অপরিবর্তমান অংশটা হলো সাড়ে ৪ হাজার পাউন্ড, পরিবর্তমান অংশ দেড় হাজার পাউন্ড। অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থায় পরিবর্তমান মোট অংশ পুঁজির চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। তা হলে দেখা গেল, মজুর কমিয়ে যে অর্থ খালাস করা হলো, তা এমনভাবে আটকে রাখা হলো যে, শ্রম-শক্তি কেনার জন্য তার কিছুই পাওয়া গেল না। এভাবের ব্যবস্থাই যদি চলে তাহলে ৬ হাজার পাউন্ডে ৫০ জন মজুরকে মাত্র খাটানো যেতে পারে। মেশিনের উৎকর্ষের সাথে সাথে আরো কম মজুরকে খাটানো হবে। নতুন মেশিনের দাম যদি দেড় হাজার পাউন্ড না হয়ে এক হাজার পাউন্ড হয়, তবে আরো ৫০০ পাউন্ড পুঁজি খালাস হবে। এই ৫০০ পাউন্ডকে পুঁজি হিসাবে খাটালে আগের সেই মজুরিতে ৫০ জন শ্রমিকের ভেতর থেকে ১৬ জনকে কাজ দেয়া যেতে পারে, তাও সম্ভব না; কেননা ৫০০ পাউন্ডের ভেতর একটা অংশ অপরিবর্তমান পুঁজি হিসাবে খাটবে অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল কিনতে খরচ হবে; সুতরাং ১৬ জনেরও কম শ্রমিক নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। এই দৃষ্টান্তটা থেকে কি প্রমাণ হয় যে মেশিনের প্রয়োগে শ্রমিক যেমন কর্মচ্যুত হয় তেমনি পুঁজিও খালাস হয়ে সেই সব শ্রমিককে উৎপাদনে পুনঃনিয়োগে সাহায্য করে? আমরা দেখলাম, মেশিন যে সংখ্যক শ্রমিককে বেকার করল, তার চেয়ে অনেক কম শ্রমিককে পরে কাজ দিতে পারে। এই সব শ্রমিকরা বেকার হওয়ায় তারা আগে যে সব দ্রব্যাদি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিনত তা আর কিনতে পারবে না। ফলে যে সব কারখানায় গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণসমূহ প্রস্তুত হয়, সেখানেও উৎপাদন সংকুচিত হবে, অনেক শ্রমিককে কাজ থেকে অবসর দেয়া হবে, বেকারগ্রস্তদের সংখ্যা আরো বাড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, গ্রাসাচ্ছাদন তৈরির উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি তৈরির প্রয়োজনও কম হবে, সুতরাং সে সব কারখানা থেকেও বহু শ্রমিক বিদায় নিতে বাধ্য হবে। এভাবে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে যে সব কারখানায় শ্রমিকরা এখনো কাজ করছে, পুঁজিপতির পক্ষে তাদের মজুরি কমিয়ে দেওয়ার সুযোগ হবে। ফলে শ্রমিকদের হাতে অর্থ কমে তাদের ক্রয়শক্তি এতো হ্রাস পাবে যে বাজারে দ্রব্যাদির চাহিদার খুবই পড়তি দেখা যাবে। এভাবে অর্থ সংকটের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

কৃষির ভেতর ঢুকে বর্তমান উৎপাদন প্রণালী পুরনো উৎপাদন প্রথার সংরক্ষক কৃষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করেছে। তাই শহরে যেমন, তেমনি গ্রামেও শ্রেণী-বিরোধ একই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কৃষি ও মেনুফেকচারের ভেতর আগে যে সংযোগ ছিল, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা সম্পূর্ণভাবে তার মূলোৎপাটন করল। কিন্তু তা করলেও

এটি কৃষি ও শিল্পের ভিতর ভবিষ্যতে আরো উচ্চতর একটা সংযোগ ও মিলনের রাস্তা পরিষ্কার করেছে। বর্তমান বিচ্ছেদ সাময়িক। কৃষকগণকে ভূমিহীন মজুরে পরিণত করে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী তাদের জীবনী শক্তিকে শ্বাসরোধ করে মেরেছে, তাদের স্বাধীনতা হরণ করে মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ খুঁজেছে; সর্বোপরি বিভিন্ন জায়গায় কৃষকেরা ছড়িয়ে রয়েছে বলে ও এজন্য সংঘবদ্ধ হতে না পারায় পুঁজির দৌরাত্মকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তারা হারিয়েছে। শহরে শ্রমিকেরা একই জায়গায় অথবা পাশাপাশি বহু লোক সমবেতভাবে কাজ করে বলে সংঘবদ্ধ হওয়া তাদের পক্ষে খুব কঠিন হয় না। শ্রমিকরা তাই শ্রেণী বিরোধের সংগ্রামে কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পুঁজিতান্ত্রিক কৃষিকাজে শুধু শ্রমিককেই যে শোষণ করা হয় তা নয়, ভূমিকে শোষণ করে এর উর্বরাশক্তি নষ্ট করাও তার উদ্দেশ্য। ক্ষণিকের জন্যে হয়তোবা জমির উর্বরা শক্তির উন্নতি সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এর মূল যে ক্রমেই নষ্ট হচ্ছে তা নিঃসন্দেহ। তা হলে দেখা গেল, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে সব ধনদৌলতের মূল মানুষ ও জমি, দুই-ই শোষণ থেকে রেহাই পায়নি।

শ্রম প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক রূপগুলোকে বাদ দিয়ে এর সম্পর্কে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃতি ও মানুষের ভেতর একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছাড়া এটি আর অন্য কিছুই নয়। সমস্ত শ্রম প্রক্রিয়াটাকে যদি আমরা ফলাফলের দিক থেকে লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাব শ্রমের যন্ত্রপাতি ও শ্রমের বিষয় (কাঁচামাল ইত্যাদি) সবই উৎপাদনের উপকরণ।

শ্রম প্রক্রিয়া যতোক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে নির্বাহিত হয়, ততক্ষণ সব রকম কাজ একজন শ্রমিককেই করতে হয়। ধীরে ধীরে এই কাজগুলো বিভাগ হয়ে বিভিন্ন লোক দিয়ে সম্পন্ন হয়। একজন ব্যক্তি যখন প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, তখন সে-ই তার নিজের কর্তা; মনিব বলে কেউ থাকে না। শ্রমকারী যদি মাত্র একজন লোকই হয়, তাহলে মাংসপেশির চালনা যেমন করে সে, তেমনি বুদ্ধিও খাটাতে হয় তার নিজেকেই। তখন মাথা ও হাতের কাজ একজন লোকের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়। কালক্রমে এরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এমনকি একে অন্যের মারাত্মক শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। দ্রব্য উৎপাদন তখন আর একজনের কাজ থাকে না, সমবায় শ্রমের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদিত হতে থাকে। এই সমবায়ের ভেতর ব্যক্তিগত শ্রমিকেরা মাত্র বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পাদন করে থাকে। এইভাবের সমবায়-শ্রম প্রবর্তিত হলে, শ্রমের সংজ্ঞা খানিকটা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে শ্রমিক শুধু পণ্যই উৎপাদন করে না, এর মূল কথা হলো উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন। শ্রমিক উৎপাদন করে—নিজের ভোগের জন্যে নয়, পুঁজিপতির মুনাফার জন্যে। সুতরাং শ্রমিক উৎপাদন করে শুধু এটুকু বললে কিছুই বোঝা গেল না, তাকে উৎপাদন করতে হবে উদ্বৃত্ত মূল্য। যে শ্রমিক পুঁজিপতির জন্যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে এবং পুঁজির প্রসারে সাহায্য করে সেই যথার্থ উৎপাদনকারী। অন্য রকম একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বোঝানো সহজ হবে। একজন শিক্ষক বিদ্যাদান করে নিজের উপার্জন করে ভাল কথা, কিন্তু শিক্ষাদান করে তার মনিবের জন্যে যদি সে মুনাফা সৃষ্টির

ভারও নেয়, তবে তাকে শিক্ষালয় ফ্যাক্টারীর শ্রমিক ছাড়া আর কি বলা চলে? পুঁজিপতি চিনির কারখানায় পুঁজি না খাটিয়ে যে শিক্ষা নিকেতনে পুঁজি খাটিয়েছেন, তাতে কিছুই তারতম্য হয়নি; কেননা তার লক্ষ্য উৎপাদনের রকম নয়, মোটা রকমের মুনাফা আত্মাসাৎ করাই তার লোভ। সুতরাং উৎপাদনকারী শ্রমিক বলতে আমরা শ্রমিক ও তার উৎপাদিত দ্রব্যের ভেতরের সম্বন্ধই বুঝি না; বাস্তবিক এটা একটা সমাজ-ঘটিত সম্বন্ধ এবং একটা বিশিষ্ট প্রকারের সমাজ অবস্থা; ইতিহাসের পরিবর্তন থেকে তা উদ্ভুত হয়েছে। সুতরাং উৎপাদনকারী শ্রমিক হওয়া মোটেই সৌভাগ্যের বিষয় না, শ্রমিকের পক্ষে তা দুর্ভাগ্য মাত্র।

যে সময়টুকু শ্রমিকের পক্ষে তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী মূল্য উৎপাদনের জন্য কাজ করা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি সময় শ্রমিককে খাটিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করা হয়, তাকে আমরা 'অনপেক্ষ উদ্বৃত্ত-মূল্য' আখ্যা দিয়েছি। মোটামুটি এই হলো পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি এবং 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য' অর্জনের এই হলো শুরু। পরবর্তী উদ্বৃত্ত মূল্যটা পেতে হলে আগে থেকেই শ্রম দিবসের অবশ্য শ্রম-সময় ও উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়-এই দুইভাবে ভাগ চাই। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়াতে হলে এমন ভাবের ব্যবস্থা চাই যেন অবশ্য শ্রম সময় কমানো সম্ভব হয়। অনপেক্ষ উদ্বৃত্ত মূল্য নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে শ্রম দিবসের বিস্তারের উপর; আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য জাত হয় উৎপাদনের যন্ত্রপাতির সংস্কার থেকে। যন্ত্রপাতির পরিবর্তন মাধ্যমে শ্রমিকের দাসত্ব সম্পূর্ণ কায়েমী করে নেওয়া হয়।

শ্রম দিবসের সবগুলো ঘন্টাই তার ভরণপোষণের উপযোগী মূল্য উৎপাদনের জন্য দাবী করে বসলে অন্যের জন্য বিনা মজুরিতে খাটার সময় তার হাতে অবশিষ্ট থাকে না। শ্রমিকের শ্রমের ভেতর একটা বিশিষ্ট মাত্রার উৎপাদনী শক্তি যদি না থাকে, তবে অন্যের মুনাফা সৃষ্টির জন্যে অতিরিক্ত সময় থাকতে পারে না। এই অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টির জন্যে অতিরিক্ত সময় শ্রমিকের হাতে না থাকলে উদ্বৃত্ত শ্রম সময় জাত হতে পারে না; পুঁজিপতি, অভিজাত-এক কথায় বিত্তাধিকারী জাতিটারই অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

মনে হয়, উদ্বৃত্তমূল্যের ভিত্তিটা যেন একটা অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা; স্বাভাবিক কথাটা আমরা ব্যবহার করলাম খুব ব্যাপক অর্থে। একজন মানুষ যদি অন্য একজন মানুষের মাংস খেতে চায়, তাহলে যেমন প্রাকৃতিক কোনো বাধা নেই, তেমনি একজন লোক নিজে না খেটে যদি অন্য লোকের উপরে খাটুনির ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজে অবসর ভোগী হতে চায় তাহলেও কোনোরকম বাধা জন্মায় না। শ্রমের উৎপাদনী শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ অনৈতিহাসিক ধারনা না থাকাই উচিত। মানুষ যখন ঠিক পশুর স্তর থেকে উঠে এসেছে ও তার শ্রম খানিকটা সামাজিক শ্রমে পরিণত হয়েছে, তখনই একজন লোককে অন্য একজন লোক উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের জন্য নিয়োগ করতে পারে। সভ্যতার গোড়াতে শ্রমের উৎপাদনী শক্তি ছিল খুবই অল্প, মানুষের অভাব এবং চাহিদাও তখন তেমন বাড়েনি। সে সময়ের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করত খুবই মুষ্টিমেয় লোক। শ্রমের উৎপাদনী শক্তি

বৃদ্ধির সাথে সাথে এই শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে পুঁজি এবং আনুষঙ্গিক সমাজ সম্পর্কগুলোর আবির্ভাব হয়; এই আবির্ভাব একদিনের ইতিহাস নয়, যুগে যুগে অর্থনৈতিক পরিবর্তন থেকে বহুসহস্র শতাব্দীর ব্যবধানে এই অতি ভয়ঙ্কর শ্রেণী বিভেদমূলক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

সামাজিক উৎপাদন কতোখানি বিকশিত হয়েছে, শুধু তাই না দেখে আরো একটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদন না করে সমষ্টিগতভাবে উৎপাদনে উৎপাদনশক্তি অবশ্য বাড়বে, কিন্তু প্রাকৃতিক কতোগুলো ব্যাপারেও উৎপাদন শক্তির তারতম্য হয়। এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করে আমরা দেখতে পারি। (১) প্রাকৃতিক ধন-দৌলত অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদির যেমন ফল-মূল মাছ ইত্যাদি (২) উৎপাদনের সহায়ক বিষয়সমূহ, যেমন জলপ্রপাত, নদী, জঙ্গল, ধাতু, কয়লা ইত্যাদি। সভ্যতার শুরুতে প্রথম শ্রেণীর জিনিসগুলোরই বেশি প্রয়োজন হয়। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে দ্বিতীয় স্তরের জিনিস ও বিষয়গুলোই বেশি উপযোগী হয়ে ওঠে। এখনও যদি আমরা ইংল্যান্ড ও ভারতের তুলনা করি, উপরোক্ত উক্তির সভ্যতা প্রমাণিত হবে।

কষ্ট করে যে সব অভাব মিটাতে হয়, তাদের সংখ্যা যদি কম হয়, জমির উপর্বরাশক্তি যদি বেশি হয়, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুকুল হয়, উৎপাদনকারীর জীবনধারণের জন্যে যে পরিমাণ শ্রম দেওয়া আবশ্যক তা কম হলেও চলতে পারে। সুতরাং যে শ্রম করে তার অতিরিক্ত সময়ও থাকে প্রচুর, এই সময়ের ব্যবহার সে করতে পারে অন্যের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য। প্রাচীন যুগের মিশরীয়দের সম্পর্কে একথা খুবই খাটে। প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল ছিলো বলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাদের শ্রম সময়ের পরিমাণ ছিলো খুবই কম। প্রচুর সময় তাদের হাতে থাকত, তই ধনিকের বিলাস-ব্যাসন চরিতার্থ করার জন্য তারা বড় বড় সৌধ এবং অত্যাশ্চার্য পিরামিড তৈরি করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষের তাজমহল ইত্যাদির পেছনেও উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের প্রাচুর্যের ইতিহাসই লুকানো আছে।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে। প্রকৃতি যেখানে তার দানে কার্পণ্য করে না, সেখানেই প্রকৃতি মানুষকে শিশুর মতন তার নিজের আয়ত্তে রাখে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ সেখানে আপন শক্তি ও প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারে না। পুঁজিতন্ত্রের দেশগুলোর ইতিহাস খুঁজলে আমরা দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলোতেই প্রথিম পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে, প্রাচ্যের গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলোতে নয়। প্রথমোক্ত দেশগুলোতে প্রকৃতির কৃপণতা বেশি, তাই এখানকার মানুষের পক্ষে বিকাশের সুযোগ মিলেছে আগে।

অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সম্ভাব্যতার নির্দেশ পাওয়া চলে। শ্রমের প্রকৃতিগত পরিবেশের তারতম্য দিয়ে এইটুকু বোঝা যায়, একটা বিশেষ সময় কাজ করে কতটুকু জীবন ধারণের উপকরণ উৎপাদিত হতে পারে। তা থেকেই ঠিক হবে বিভিন্ন দেশে অবশ্য শ্রম-সময়ের পরিমাণ কেমন। প্রাকৃতিক পরিবেশ নিরূপণ করে দেবে, কতো ঘণ্টা শ্রমের পর থেকে উদ্বৃত্তমূল্য সংগ্রহের শ্রম

সময় শুরু হবে। যতোই শিল্প অগ্রসর হবে ততোই এই প্রকৃতি নির্দিষ্ট সময়ের পরিসর ছোট হবে। শিল্প-প্রধান দেশে শ্রমিক জীবন ধারণের জন্য শ্রম করার অধিকার ক্রয় করে, এই অধিকারের জন্য পুঁজিপতিকে সে উদ্বৃত্ত মূল্যরূপ দাম দিতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থাটা থেকে সাধারণত এটিই মনে হয়, অতিরিক্ত উৎপাদন বুঝি শ্রমের একটা নিজস্ব ধর্ম। এশিয়াটিক আর্কিপেলাগোর একজন অধিবাসীর কথাই ধরা যাক। অতি সহজেই, বিনা আয়াসেই প্রায় সে একটা সাগু গাছ থেকে ৩০০ হতে ৬০০ পাউন্ড পর্যন্ত সাগু সংগ্রহ করে থাকে। সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ একটা শ্রমদিবস কাজ করলেই তার সমস্ত রকমের অভাব মিটতে পারে। প্রকৃতি তাকে প্রচুর অবসরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই পর্যাপ্ত অবসরের যদি উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে হয় তবে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশেই তা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু বিদেশাগত পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মূল্য যোগানোর জন্যেই যদি এই অবসরের ব্যবহার করতে হয় তবে তার আগে প্রয়োজন জুলুম ও জবরদস্তি করে তাকে বাধ্য করা। যেই সেখানে পুঁজিতান্ত্রিক রীতি প্রবর্তন করা গেল অমনি একদিনের শ্রম দিয়ে আপন ভরণপোষণের সংস্থান করার জন্য আর্কিপেলাগোর অধিবাসীকে আরো ছয়দিন পুঁজিপতির জন্য খেটে দিতে বাধ্য হতে হবে। এই অবস্থায় দেখা গেল, প্রকৃতির দানের প্রচুরতা কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারছে না এক্ষেত্রে, কেনই বা সে সারা সপ্তাহ কাজ করবে, অথবা সাতদিনের ভেতর ছয়দিনের খাটুনি দ্বারা পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য জোগাবে। প্রকৃতির দানশীলতা খালি এতোটুকু বলে দেয় যে নিজের ভরণপোষণের জন্যে একদিন কাজ করলেই চলতে পারে; বাকী ছয়দিনের ইতিহাস সম্পূর্ণই সামাজিক। এটিই প্রমাণিত হলো উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি শ্রমের অন্তর্নিহিত কোন শক্তি দিয়ে হয় না।

মজুরি

বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকের মজুরিকে মনে হয় যেন এটি শ্রমেরই মূল্য; একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের জন্যে এই মূল্য একটা বিশেষ পরিমাণের মুদ্রায় প্রকাশিত হয়। তাই সাধারণত আমরা মজুরিকে শ্রমের মূল্য বলতে দ্বিধা করি না। কিন্তু পণ্যের মূল্য কাকে বলে? একটা পণ্য তৈরিতে যে শ্রম ব্যয় করা হয় তাই পণ্যের মূল্য। এই শ্রমকে আমরা পরিমাপ করি কিভাবে? যে সময়টুকু শ্রম করা হয়, সেই সময়ের আয়তন দিয়ে। ধরা যাক, শ্রম করা হয়েছে ১২ ঘণ্টা, এখন যদি বলি শ্রমের মূল্য, তা হলে এটি হয়ে দাঁড়ায় ১২ ঘণ্টার মূল্য। ১২ ঘণ্টার মূল্য নিশ্চই ১২ ঘণ্টা–এরূপ বলাটা হাস্যকর মনে হবে। তাই শ্রমের মূল্য বলা অসঙ্গত। আগে আমরা দেখেছি মূল্য প্রকৃতপক্ষে শ্রম শক্তির। পণ্য হিসাবে বাজারে বিক্রিত হতে হলে শ্রমের আগে থেকেই স্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু শ্রমিক যদি শ্রমকে স্বাধীন অস্তিত্ব দিয়ে বাজারে বিক্রিই করতে পারত, তা হলে সে পণ্যই বিক্রি করত, শ্রম বিক্রি করত না।

১২ ঘণ্টায় যে মূল্য উৎপাদিত হয় তার সমস্ত অংশটাই যদি শ্রমিক পায় তাহলে পুঁজিতন্ত্র দাঁড়াবে কিসের ওপর, পুঁজিপতির মুনাফা আসবে কোথা থেকে?

ধরা যাক, বাজারে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতির মুখোমুখি হয় শ্রমিক, শ্রম নয়। শ্রমিক যে পণ্যটা বিক্রি করে তাকে বলা হয় শ্রম শক্তি। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে কারখানায় শ্রম শুরু করা মাত্রই তা হয় পুঁজিপতির স্বত্ব। শ্রম আত্মপ্রকাশ করে কারখানায়, কারখানায় যাবতীয় জিনিসের মালিক পুঁজিপতি, সুতরাং শ্রমিক তা বিক্রি করবে কোন অধিকারে? শ্রম মূল্যের সারবস্তু, তা পণ্যের ভেতর লুকানো থেকে পণ্যের মূল্যের পরিমাপক হয়- এর নিজের কোনো মূল্য নেই। সুতরাং শ্রমের মূল্য একটা কাল্পনিক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথায় এসব অযৌক্তিক কল্পনার বিশেষ প্রয়োজন থাকে।

ক্লাসিক্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমি প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবন থেকে 'শ্রমের বাজার দর' এই কথাটা নির্বিচারে ধার করে নিয়েছে। তাদের একমাত্র প্রশ্ন কি করে এই বাজার দর নিরূপিত হয়? উত্তরে তারা বলে, শ্রমের চাহিদা এবং যোগান দিয়ে এই বাজারদর নিরূপিত হবে; শিঘ্রই তারা দেখতে পায় যে এই বাজারদর এক একদিন এক এক রকম হয়ে থাকে; কিন্তু প্রতিদিনের এই বিভিন্ন বাজার দরেরও যে একটা মধ্যক রয়েছে তা তারা স্বীকার করেছেন। এই মধ্যকটিই তাদের মতে স্বাভাবিক বাজার দর। কিন্তু এগুলোর যথার্থ অর্থ ক্লাসিক্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমি তলিয়ে দেখে নি। এই স্বাভাবিক বাজার দরটা নিরূপিত হয় পণ্যের উৎপাদন খরচ দ্বারা। কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন খরচ কি? শ্রমিক নিজেকেই প্রতিদিন উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করছে। তার একটা খরচ আছে। শ্রমিকের নিজেকে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন আসলে শ্রমশক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ছাড়া আর অন্য কিছু কি? সুতরাং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের 'শ্রমের মূল্য' প্রকৃতপক্ষে শ্রমশক্তিরই মূল্য।

একদিনের বার ঘণ্টা শ্রমিককে কাজ করিয়ে ছয় ঘণ্টায় সে যে মূল্য উৎপাদন করে তা-ই তাকে শ্রম-শক্তির মূল্য হিসাবে দেয়া হয়। ধরা যাক, এই মূল্যের পরিমাণ ৩ শিলিং। পুঁজিপতি বলে থাকে, একদিনের শ্রমের জন্যে শ্রমিককে ৩ শিলিং মজুরি দেয়া হল। এই উক্তির অসারতা আমরা আগেই দেখেছি, কিন্তু যতোই অযৌক্তিক হোক এতে পুঁজিপতির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শ্রমশক্তির মূল্য মজুরিতে পরিণত হল; কিন্তু বলার কায়দায় অর্থাৎ একদিনের জন্য মজুরি এই ভাবের উক্তিতে আসল সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। 'একদিনের জন্য মজুরি' বলাতে মনে হয় মজুরকে মোটেও ঠকানো হয়নি; সে যতোটা শ্রম করেছে সেই অনুরূপই তাকে মজুরি দেয়া হয়েছে। সাধারণ লোকের কাছে এই ধরনের উক্তিতে ধারণা হয় যে শ্রমদিবসটা বুঝি অবশ্য শ্রম সময় এবং উদ্বৃত্ত শ্রম সময় এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। মধ্যযুগের 'কর্ভি ব্যবস্থায়' (Corvee system) স্পষ্টই দেখা যায়, কৃষক সপ্তাহে চারদিন ভূস্বামীর জমিতে কাজ করছে এবং বাকী তিনদিন নিজের জমিতে কাজ করছে। এক সপ্তাহের মধ্যে যে দুটো ভাগ রয়েছে, সে বিষয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। অতীত যুগের দাসত্ব ব্যবস্থায় মনে হয় দাস বুঝি সবটা সময়ই তার প্রভুর জন্যে খাটছে; খাটুনির পুরো সময়টার ভেতরে অবশ্য শ্রম-সময়রূপ যে একটা অংশ আছে, তা একেবারেই ঢাকা পড়ে যায়। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুরি রূপটা অন্য রকমের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। একদিনের জন্যে মজুরি বলাতে মনে হয় যেন

শ্রমিক বুঝি ১২ ঘণ্টা শ্রম করে যা উৎপাদন করছে তার সবটুকু অংশ মজুরি হিসাবে পেয়েছে; শ্রম দিবসের একটা অংশ যে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় তা একেবারেই ঢাকা পড়ে গেল।

এখন আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম শ্রমশক্তির মূল্যকে মজুরি নামে অভিহিত করার সার্থকতা কি। শ্রমশক্তি-মূল্যের বাহ্যিক রূপ মজুরি প্রকৃত অবস্থাটাকে এবং মানুষে মানুষে যথার্থ সমাজ সম্পর্কটাকে গোপন রেখে উল্টো জিনিসটাকেই দেখিয়ে দিয়েছে। এই বাহ্যিক রূপটাই হলো শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে চুক্তির এবং আইনের ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি; শুধু তাই নয়, পণ্ডিত অর্থনীতিবিদদেরও জনসাধারণকে ফাঁকি দেয়ার একটা মস্ত উপায়।

ইতিহাস হয়ত বা বর্তমান সময়ে এই বিষয়টাকে তলিয়ে দেখছে; কিন্তু এই বাহ্যিক রূপটার প্রয়োজনীয়তাটা পুঁজিপতি বর্তমান উৎপাদন প্রথার গোড়াতেই উপলব্ধি করেছে।

মজুরি বহু রকম রূপ নিয়ে থাকে। শ্রমশক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রি করা হয়। দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক শ্রমশক্তির মূল্য টাইম-মজুরির রূপে পরিবর্তিত হয়। এই টাইম-মজুরিকে আমরা দিন-মজুরির রূপে দেখতে পারি।

বার ঘণ্টা কাজ করে শ্রমিক হয়তো বা ৩ শিলিং উপার্জন করে, প্রতি ঘণ্টায় তা হলে তার উপার্জন হয় ৩ পেন্স; একে বলা হয় শ্রমের বাজার দর। সাপ্তাহিক অথবা দৈনিক মজুরির পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে শ্রম দিবসের ঘণ্টার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের বাজার দরও বিভিন্ন হতে পারে। শ্রম দিবস ১২ ঘণ্টা হলে ৩ পেন্স হয় শ্রমের বাজারদর, কিন্তু ১৫ ঘণ্টা হলেই তা অনেকখানি নেমে আসে।

তা হলে দেখা গেল শ্রমের বাজারদর কমলেও দৈনিক বা সাপ্তাহিক বাজার দর একই পরিমাণের থাকতে পারে। আবার এও সত্যি, শ্রমের বাজারদর যদিও একই থাকে অথবা কমেও, তবু দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি বাড়তে পারে। শ্রমদিবস যদি দশ ঘণ্টা হয় এবং শ্রমশক্তির দৈনিক মূল্য হয় তিন শিলিং, তবে প্রতি ঘণ্টার বাজারদর হবে সাড়ে তিন পেন্স। এখন শ্রমিককে দিয়ে ১২ ঘণ্টা কাজ করানো হলে এবং শ্রমের বাজার দর আগের মতোই থাকলে তার দিন-মজুরি হবে ৩ শিলিং ৭$\frac{১}{২}$ পেন্স।

পুঁজিপতি যদি শ্রমিককে শ্রমদিবসের নির্দিষ্ট ঘণ্টা না খাটিয়ে কম ঘণ্টা খাটায় অথচ প্রতি ঘণ্টার জান্যে আগের মতোই মজুরি দেয়, তাহলে দিনের অথবা সপ্তাহের নির্দিষ্ট মজুরি তাকে না দিলেও চলে। ধরা যাক যেন শ্রমিককে ৬ ঘণ্টা খাটানো হলো এবং তাকে দেয়া হলো মাত্র পূর্ব নির্দিষ্ট ১০ ঘণ্টার শ্রমদিবসের প্রতি ঘণ্টার বাজার দর হিসাবে; ৬ ঘণ্টায় শ্রমিক প্রতি ঘণ্টার বাজার দরের ৬ গুণ পেল বটে কিন্তু শ্রম শক্তির মূল্যের অনুরূপ দিনমজুরি সে পেল না। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রমিক প্রতিদিনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যতোখানি তার না হলেই নয়, তা পেল না, কিন্তু প্রতি ঘণ্টার অর্ধেক ঘণ্টায় যে মূল্যজাত হলো পুঁজিপতি তা উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে সংগ্রহ করলো। পুঁজিপতি বাহ্যত দেখাতে পারল, শ্রমিককে ঘণ্টা হিসাবে তার মজুরি মিটিয়ে দেয়া হয়েছে; কিন্তু শ্রমিক যে তার জীবন ধারণের উপযোগী মূল্য পেল না

অথচ পুঁজিপতি তার মুনাফা যা পাবার তা উঠিয়ে নিয়েছে, এই আসল সত্যটা ঢাকাই রয়ে গেল। পুঁজিপতি যে শুধু শ্রমিককে কম ঘণ্টা খাটিয়ে জীবন ধারণের উপযোগী দৈনিক মজুরি থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে এমন না, শ্রমদিবসের নির্দিষ্ট ঘণ্টার অতিরিক্ত তাকে খাটিয়ে উপযুক্ত দর নাও দিতে পারে। নির্দিষ্ট ঘণ্টার পরও যদি তাকে অতিরিক্ত আরো তিন ঘণ্টা খাটানো হয়, অথচ তাকে প্রতিঘণ্টার পূর্ব-নির্দিষ্ট হারেই এই তিন ঘণ্টার মজুরি দেয়া হয়, তাহলে অতিরিক্ত সময় খাটনির জন্যে যে পরিমাণ শ্রম-শক্তির অপচয় হলো তার উপযুক্ত মূল্য তাকে মোটেই দেয়া হলো না।

প্রতি ঘণ্টার হিসাবে শ্রমিককে মজুরি দেয়ার রীতিতে পুঁজিপতির গুপ্ত অভিসন্ধি কার্যকরী হয়; সে দেখাতে পারে শ্রমিককে যতোটা খাটানো হচ্ছে ততটুকুই তাকে মজুরিও দেয়া হচ্ছে। পুঁজিপতির জন্যে যেন কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত মূল্য অবশিষ্ট থাকে না।

আরো এক রকম মজুরি আছে। তাকে বলে পিস্ মজুরি। দৈনিক কাজের পরিমাণ দেখে সে অনুযায়ী শ্রমিককে মজুরি দেয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মজুরি টাইম মজুরি ছাড়া অন্য কিছুই না। টাইম মজুরিতে শ্রমের পরিমাণ মাপা হয় যতোখানি সময় কাজ করা হয়েছে তা দিয়ে; পিস্ মজুরিতে শ্রমকে মাপা হয় একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে কত পরিমাণ দ্রব্য অর্থাৎ কয়টা পিস তৈরি করা হয়েছে তা দিয়ে। সুতরাং পিস্ মজুরির ব্যাপারেও সময় অনুযায়ী শ্রম মাপাটাই হচ্ছে। আমরা আগেই দেখেছি শ্রম-শক্তির মূল্যের টাইম মজুরি রূপটা অযৌক্তিক; এটি মূল্য উৎপাদনে শ্রমিক-পুঁজিপতির ভেতর যে শোষক শোষিতের সম্পর্ক রয়েছে তা ঢেকে রাখে। পিস্ মজুরির কাজও তাই। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, একটা নির্দিষ্ট সময়ে 'ক' যখন 'খ' থেকে বেশি উৎপাদন করে এবং 'খ' থেকে বেশি মজুরি দেয়া হয় তা হলে নিশ্চই শ্রমিক যতটুকু উৎপাদন করে ততটুকুই তাকে দেয়া হচ্ছে। 'ক' নির্দিষ্ট সময়টাতে আগের চেয়ে আরো বেশি মজুরি উপার্জন করে; সুতরাং শ্রমিক তার ন্যায্যটা পুঁজিপতির কাছ থেকে পাচ্ছে। এমন ভ্রান্ত ধারণা পিস মজুরি থেকে আমাদের জন্মাতে পারে।

পিস্ মজুরি ব্যবস্থায় পুঁজিপতির পক্ষে শ্রমিককে বেশি করে শোষণের সুবিধা হয়। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের উপর নজর রাখার জন্যে কড়া পাহারা ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হয় না। কেননা শ্রমিক নিজের গরজেই বেশি করে কাজ করবে, পুরো মজুরি পেতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর নির্দিষ্ট সংখ্যার কাজ দিতে হবে। বেশি কাজ দেখাতে পারলে বেশি মজুরির সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং শ্রম দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দিয়ে শ্রমিক বেশি ঘণ্টা কাজ দিতে তৎপর হয়।

পুঁজির সঞ্চয়

যে মূল্যটুকু পুঁজি হিসাবে কাজ করতে যাচ্ছে তার প্রথম কর্তব্য হয় উৎপাদনের উপকরণ এবং শ্রম শক্তিতে পরিবর্তিত হওয়া। এই ব্যাপারটা বাজারে পণ্যের চলাচলের ভেতর সংঘটিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ কারখানায় উৎপাদনের উকপরণসমূহ নতুন দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যাপারটা সংঘটিত হয় উৎপাদনের

ভিতরে বাজারের বাইরে। যে মূল্য পুঁজিপতি প্রথম খাটিয়েছে, তার চেয়ে বেশি হবে এই নতুন উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য। মূল্যের পরিমাণ যতোটা বেশি হলো, তাকে আমরা উদ্বৃত্ত মূল্য বলি। এই দ্রব্যগুলো নিয়ে পুঁজিপতিকে পুনরায় বাজারে আসতে হবে, এবার ক্রেতারূপে না, বিক্রেতা রূপে। এগুলো বাজারে মুদ্রায় বিক্রি করে পুনরায় সেই মুদ্রাকে পুঁজি হিসাবে খাটানো যাবে, এভাবে আবার আগের মতো চলবে। এই বৃত্তাকার সঞ্চালনকে পুঁজির রূপ পরিবর্তন বলা চলে।

সঞ্চয়ের জন্য প্রথম আবশ্যক হলো, পুঁজিপতিকে তার পণ্যগুলো বিক্রি করা চাই-ই। বিক্রয়লব্ধ মুদ্রাকে পুঁজি হিসেবে, আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ পুঁজি হিসাবে খাটানো দরকার।

পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত মূল্য প্রথম হাত করলেও একাই তা আত্মসাৎ করতে পারে না। সমাজ উৎপাদনে ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, ভূম্যাধিকারী প্রভৃতিরও অংশ আছে; উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন এদের সবার ভেতরেই হয়। মুনাফা, সুদ, ব্যবসায়িক মুনাফা, খাজনা, ইত্যাদি উদ্বৃত্ত মূল্যের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম। পুঁজি সঞ্চয়ের বিচারে আমরা একমাত্র পুঁজিপতিকেই দেখব, মনে করে নিতে হবে সবটা উদ্বৃত্ত মূল্যই বুঝি সে-ই আত্মাসাৎ করে থাকে।

সমাজ-উৎপাদনের রূপ যাই হোক না কেন, একে একটা ক্রমিক প্রক্রিয়া হতে হবে। একই প্রকারের বিশিষ্ট স্তরগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে হবে বারবার। সমাজ যেমন দ্রব্য-সামগ্রী সম্ভোগ থেকে বিরত হতে পারে না, তেমনি এগুলোর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন না করে পারে না। তাই, যখনই আমরা সমাজ উৎপাদনকে একটা অবিচ্ছিন্ন সমগ্র হিসাবে দেখি এবং একে পুনঃপুন আবর্তিত হতে দেখি তখন আমরা সমাজ উৎপাদনকে সামাজিক পুনরুৎপাদন রূপে না দেখে পারি না।

কোনো সমাজের পক্ষেই ক্রমিক উৎপাদন সম্ভবপর না, যদি না তা উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মূল্যের একটা অংশকে নিরন্তর উৎপাদনের উপকরণাদিতে পরিবর্তিত করে। উৎপাদন পুঁজিতান্ত্রিক হলে পুনরুৎপাদনও পুঁজিতান্ত্রিক হবে হবে। এ বছর একশ পাউন্ডকে পুঁজিতে রূপ দেওয়া হয়েছে, দশ পাউন্ড উদ্বৃত্ত মূল্য জাত হয়েছে, ঠিক এটি পরের বছরগুলোতেও হতে হবে। উদ্বৃত্তমূল্য হয়ত বা পুঁজিপতি আপন সম্ভোগের জন্যে খরচ করে ফেলে, কিন্তু পুঁজির পরিমাণ বরাবরই একই রকম থাকতে হবে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সবখানিই পুঁজিপতি আপন প্রয়োজনে খরচ করে ফেললে এবং একই পরিমাণ পুঁজি বারবার খাটালে আমরা তাকে বলি সরল পুনরুৎপাদন।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম সূচনা হয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে শ্রম-শক্তির ক্রয় থেকে। যখনই নির্দিষ্ট সময়টা অতিক্রান্ত হয়, তখনই শ্রমশক্তি পুনরায় ক্রয় করতে হবে। কিন্তু শ্রমিক যতক্ষণ না তার শ্রম-শক্তিকে খরচ করে দ্রব্য উৎপাদন ও মূল্য বৃদ্ধি করছে ততক্ষণ সে তার পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত থাকে। শ্রমিক যে শুধু উদ্বৃত্ত মূল্যই উৎপাদন করছে তা নয়, যে মূল্য দিয়ে তার মজুরি দেয়া হবে তাও তাকে আগেই উৎপাদন করতে হয়েছে। শ্রমিকের ততক্ষণই চাকুরী থাকবে যতক্ষণ সে তা

পুনরুৎপাদন করতে পারবে। পুঁজিপতি অবশ্য মুদ্রায় মজুরি দিয়ে থাকে, কিন্তু এই মুদ্রা শ্রমিকের উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রিরই পরিবর্তিত রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তার গত সপ্তাহের শ্রমে উৎপাদিত মূল্য থেকে চলতি সপ্তাহে তাকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়।

আমরা আগে দেখেছি, পণ্যের উৎপাদন এবং চলাচল ছাড়া মুদ্রার পুঁজিতে পরিণত হওয়ার আরো একটা বিষয় আছে। একদিকে মুদ্রার মালিক অথবা উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক আর অন্যদিকে শুধু শ্রমশক্তির মালিক—এই দুই এর পরস্পর সম্মুখীন হতে হবে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল কথাই হলো, শ্রম-শক্তির মালিককে শ্রমোৎপাদিত পণ্য এবং উৎপাদনের উপকরণগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। যা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল, তা-ই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ফল-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমেই বেশি সংখ্যক লোক দ্রব্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমিককে শোষণ করার উপায় এভাবে ক্রমেই বেড়ে চলছে। পুঁজিতান্ত্রিক প্রথাকে একটা ধারাবাহিক শ্রম হিসাবে দেখলে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে তা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ছাড়া অন্য কিছু না, এটি শুধুই পণ্য প্রস্তুত করে না, শুধুই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে না, তা পুঁজিতান্ত্রিক সম্বন্ধগুলোকে সৃষ্টি ও পুনসৃষ্টি করে। একদিকে পুঁজিপতি ও অন্যদিকে শ্রমিক—তাদের বিরোধ এই ধারাবাহিক উৎপাদন থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিভাবে পুঁজি থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য জাত হয় তা দেখেছি, এখন আমরা দেখব কিভাবে পুঁজি উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে জাত হয়। উদ্বৃত্ত মূল্যকে ভোগের জন্যে না লাগিয়ে তাকে পুঁজিতে পরিণত করে যদি উৎপাদনে খাটানো হয় তাহলে তাকে বলা হয় পুঁজির সঞ্চয় (Accumulation of Capital)।

একজন সুতা প্রস্তুতকারী পুঁজিপতি মোট ১০ হাজার পাউন্ড খাটিয়েছে। এর চার পঞ্চমাংশই খরচ হয়েছে উৎপাদনের উপকরণ কিনতে আর এক অংশ অর্থাৎ দুই হাজার পাউন্ড খরচ হয়েছে পরিবর্তমান পুঁজি হিসাবে। মোট সুতা প্রতি বছর প্রস্তুত হয়েছে ১২ হাজার পাউন্ডের। শতকরা ১০০ যদি হয় শোষণের ডিগ্রী, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হয় ২০০০ পাউন্ড।

এই অতিরিক্ত মুদ্রাকে যদি পুঁজি হিসাবে খাটানো হয় তাহলে আবার এর চার পঞ্চমাংশ দিয়ে উৎপাদনের নতুন উপকরণসমূহ কিনতে হবে। ৪০০ পাউন্ড খরচ হবে পরিবর্তমান পুঁজি হিসাবে; সুতরাং আগের শোষণের ডিগ্রী অনুসারে নতুন উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ হবে ৪০০ পাউন্ড।

পুঁজি সর্বপ্রথম খাটানো হয়েছিল মুদ্রা হিসাবে। উদ্বৃত্ত মূল্য কিন্তু সর্বপ্রথমই মুদ্রা নয়, তা মোট উৎপাদনের একটা বিশেষ অংশ। এই উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হলেই পুঁজি আবার তার মুদ্রা রূপ ফিরে পাবে। এই মুদ্রা পুনরায় পরিণত হবে উৎপাদনের উপকরণ ও শ্রম-শক্তিতে।

উদ্বৃত্ত মূল্যটাকে পুঁজি হিসাবে না খাটিয়ে যদি ভোগেই লাগানো হয়, তাহলে উৎপাদন সরল পুনরুৎপাদনের স্তরেই থেকে যাবে। উদ্বৃত্ত মূল্যের কতকাংশ আগের

পুঁজির সাথে যদি সংযোগ করে দেয়া যায় তাহলে উৎপাদনের আকার ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে– এই ভাবের পুঁজির পরিবর্ধন এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রয়োগকে আমরা বলে থাকি পুঁজির সঞ্চয়।

অধিক মাত্রায় যে এখন পুঁজি খাটানো হবে তার জন্যে প্রয়োজন অধিক শ্রম শক্তি। আমাদের দৃষ্টান্তটাতে দেখেছি, পুঁজি বৃদ্ধি পেয়ে বেশি বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। সেই পুরনো কাহিনী। আব্রাহাম জন্ম দিল আইজাককে, আইজাক জন্ম দিল জেকবকে ইত্যাদি ইত্যাদি। মূল পুঁজি দশ হাজার পাউন্ড, উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করল হাজার পাউন্ডের। সেটাকে এখন পুঁজি হিসাবে খাটানো হল, উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হলো আরো ৪০০ পাউন্ডের। এই ৪০০ পাউন্ড খাটিয়ে পুঁজিপতি আরো ৮০ পাউন্ড উদ্বৃত্ত মূল্য পেতে পারে। এভাবে বলটা গড়িয়েই চলল। হতে পারে, মূল পুঁজি পুঁজিপতি নিজে খাটিয়ে উপার্জন ও সংগ্রহ করেছে, কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে পুঁজিপতির যে অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো তার অনুমাত্রও পুঁজিপতির খাটুনি প্রসূত নয়। পুঁজি বৃদ্ধির জন্য এখন যে বেশি শ্রম-শক্তিকে কিনতে হবে, তার জন্যে মূল্য দেয়া হবে আগেকার শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে। গত বছর শ্রমিক শ্রেণী যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করেছে, তাই ব্যবহৃত হবে পরের বছরের অতিরিক্ত শ্রমিকদের মজুরি হিসাবে।

ক্লাসিক্যাল পলিটিক্যাল ইকনমি ঠিকই বলেছে, উদ্বৃত্ত দ্রব্যকে ভোগের জন্য খরচ না করে যদি শ্রমিককে দেয়া যায় তা কাজে লাগানোর জন্যে, তবেই পুঁজির সঞ্চয় সম্ভব হতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল ইকনমির এই কথাটার ভেতর যেমন সত্য আছে, তেমন ভ্রান্তিও রয়েছে। এডাম স্মিথ বলেন, সঞ্চয় অর্থই হলো শ্রমিক কর্তৃক এর প্রয়োগ; উদ্বৃত্ত মূল্যকে পুঁজিরূপ কাজে লাগানো অর্থ হলো সমস্ত উদ্বৃত্ত মূল্যটা শ্রমিককে দেয়া। কিন্তু এ কি কখনো হতে পারে? মূল পুঁজির মতো উদ্বৃত্ত মূল্যকেও দুই ভাগে ভাগ করতে হয়, একটা অংশ দিয়ে উৎপাদনের উপকরণগুলো কেনা চাই এবং অন্য অংশটা দিয়ে কেনার দরকার হয় শ্রম শক্তি। বুর্জোয়া ইকনমি পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে সব সময়ই এই বলে যে, উদ্বৃত্ত মূল্যের যে অংশটুকু পুঁজিপতি পুঁজি হিসাবে ব্যয় করে তার সবখানিই নাকি শ্রমিকদের মজুরি হিসাবেই খরচ করা হয়। এভাবে প্রতিপন্ন করতে পারলে দেখানো সম্ভব হয় যে শ্রমিকের স্বার্থ পুঁজিপতি শ্রেণী উপেক্ষা করে না।

সবখানি উদ্বৃত্ত মূল্যই শুধু পুঁজিপতির ভোগে লাগবে বা সবটাই পুঁজি হিসাবে খাটানো হবে—এ দুয়ের কোনটাই সত্যি না। প্রকৃতপক্ষে এর একটা অংশ খরচ হয় পুঁজিপতির ভোগের জন্য, অন্য অংশটা খাটানো হয় পুঁজিরূপে।

যে অংশটা মালিক পুঁজি হিসাবে খাটায় তাকে বলা চলে সঞ্চিত অংশ। পুঁজির প্রতিনিধি বলেই পুঁজিপতির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। সে যতোক্ষণ পুঁজির প্রতিনিধি ততোক্ষণ তার লক্ষ্য থাকে পণ্যের ব্যবহার মূল্য নয়, এর বিনিময় মূল্য। মূল্য বৃদ্ধিই তার একমাত্র কাম্য বলে, সে শ্রমিক শ্রেণীকে উৎপাদনের জন্যেই উৎপাদন করতে বাধ্য করে। এই ধরনের উৎপাদনে এখনকার সমাজে অপূর্ণতা ও বহুবিধ অসামঞ্জস্য থাকে বটে, কিন্তু তা আগামী সমাজের পথ পরিষ্কার করে রাখে—সে সমাজেই

একমাত্র ব্যক্তির জীবন হবে পূর্ণ বিকশিত। পুঁজিপতির ধনাকাঙ্ক্ষা ঠিক কৃপণের মতই, অনবরত পুঁজির মাত্রা না বাড়িয়ে তার পক্ষে উপায় নেই; পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ এবং প্রতিযোগিতা থেকেই পুঁজির পরিসর ক্রমেই বাড়তে থাকে। উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের বৃদ্ধি দ্বারাই তা সম্ভব।

সঞ্চয় মানেই হলো সমাজ বিত্তকে ক্রমেই আয়ত্বের ভেতর আনা। কিন্তু সর্বত্রই আদিম পাপ (original sin) আপন কাজ করে যাচ্ছে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার পরিমাণ বাড়তে থাকে। আদি পুরুষ এডামের প্রতি তার একটু হলেও সহানুভূতি থাকবেই। শিক্ষা দীক্ষায় সে যতোই অগ্রসর হতে থাকে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে সঞ্চয় করার প্রতি তার মন বিদ্রোহ করে ওঠে। পুঁজিতন্ত্রের বৃদ্ধি একটা বিশেষ মাত্রায় এসে পৌঁছলে মিতব্যয়িতার কিছুটা হানি ঘটবেই–এই অমিতব্যয়িতা তার ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। পুঁজিপতি কৃপণের মতো ধনবান হয় না। যতো বেশি না খেয়ে বাঁচাবে, ততো বেশি কৃপণের ধন বাড়বে। কিন্তু পুঁজিপতি বেশি ধনী হবে, যতো বেশি শ্রমিককে সে শোষণ করতে পারবে এবং তাকে সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে। মধ্যযুগের অভিজাতবর্গের মতো সে অপরিণামদর্শী ও অমিতব্যয়ী না হলেও পুঁজিপতির সঞ্চয়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মুনাফার পরিমাণ যেমন বাড়ে তেমনি তার খরচও বাড়তে থাকে। খরচ বাড়ার জন্য যে তার সঞ্চয় সংকুচিত হয় এমন না। কিন্তু যেমনই হোক, এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের বাসনা ও সম্ভোগের ইচ্ছার ভিতরে তার মনে বিরোধ দানা বেঁধে ওঠে।

সঞ্চয়ের জন্যই সঞ্চয় কর, উৎপাদনের জন্যেই উৎপাদন কর-এই হলো ক্লাসিক্যাল ইকনমি বর্ণিত বুর্জোয়াদের একমাত্র সূত্র। প্রলেতারিয়েত যদি হয় উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের যন্ত্র, পুঁজিপতি তবে এই উদ্বৃত্ত মূল্যকে পুঁজিতে পরিণত করার একটা উপায় মাত্র।

সিনিয়র (Senior) আবিষ্কার করলেন, পুঁজিরই অন্য নাম ভোগ থেকে বিরতি(abstinece)। এই ভাবের উক্তি হতে এই শ্রেণীর অর্থবিদরা প্রমাণ করতে চায় যে সঞ্চয় করার জন্য পুঁজিপতির দল সম্ভোগ থেকে বিরত হচ্ছে। এই যে ত্যাগ, এরই পুরস্কার মুনাফা। সম্ভোগতো দূরের কথা, শ্রমিককে সাধারণ জীবন ধারণ উপযোগী গ্রাসাচ্ছাদন থেকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের বিলাসের জন্যে খরচ বৃদ্ধিকে যদি ত্যাগ বলতে হয় তা হলে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু হয় কি?

মূল্যের দিক থেকে দেখতে গেলে, পুঁজিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি; এক ভাগ অপরিবর্তমান পুঁজি অর্থাৎ যে মূল্য দ্বারা উৎপাদনের উপকরণ কেনা হয়, অন্য ভাগ পরিবর্তমান পুঁজি অর্থাৎ পূজির যে অংশ দিয়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তি কেনা হয়। এই দুয়ের পরস্পর অনুপাতই পুঁজির গড়ন নির্ধারণ করে। একে আমরা বলব পুঁজির জৈবিক গড়ন (Organic composition)।

ব্যক্তিগত পুঁজিগুলোর বিভিন্ন রকম জৈবিক গড়ন থাকতে পারে কিন্তু একটা বিশেষ উৎপাদনে ব্যক্তিগত পুঁজিগুলোর গড়নের বিভিন্নতা থাকলেও এই বিশিষ্ট উৎপাদনের মোট পুঁজির একটা গড়পড়তা জৈবিক গড়ন রয়েছে। এই বিভিন্ন

উৎপাদনগুলোর আবার গড়পড়তা গড়নের একটা হিসাব করে আমরা মোট সামাজিক পুঁজির জৈবিক গড়ন বের করে নিতে পারি।

পুঁজির বৃদ্ধির সাথে সাথে পুঁজির পরিবর্তমান অংশ বাড়তে থাকে। প্রতিবারের যতোখানি উদ্বৃত্ত মূল্যকে অতিরিক্ত পুঁজি হিসাবে খাটানো হয় তার একটা অংশ দিয়ে প্রতিবারই শ্রমশক্তি কিনতে হবে। পুঁজি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে একদিকে যেমন বেশি অথবা কমসংখ্যক বড় বড় পুঁজিপতি সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে তেমনি বেশি সংখ্যক লোক শ্রমিকের জীবন যাপন করে পুঁজির দাসত্ব গ্রহণ করবে। পুঁজিবৃদ্ধির অর্থই হলো মজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি।

পুঁজিবৃদ্ধির একটা অবস্থায় দেখা যায়, শ্রমের উৎপাদনী শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রম বিভাগের জটিলতা ও যন্ত্রপাতির উন্নতি থেকেই এই অবস্থাটা দেখা যায়। উৎপাদনের উপকরণগুলো অর্থাৎ পুঁজির অপরিবর্তমান অংশের বৃদ্ধির সাথে সাথে পুঁজির অন্য অংশটা অর্থাৎ পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ কমতে থাকে। বস্তু উপকরণ এবং মনুষ্য উপকরণের তারতম্য পুঁজিবৃদ্ধি এবং শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত না হয়ে পারে না। আগে হয়ত পুঁজির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ খরচ হতো উৎপাদনের উপকরণগুলোর জন্যে এবং বাকী শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শ্রম শক্তির জন্যে। শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় এখন প্রথমটার জন্যে খরচ হবে শতকরা আশি ভাগ, দ্বিতীয়টার জন্যে বাকী কুড়ি ভাগ।

পুঁজিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তমান অংশের হারের আপেক্ষিক হ্রাস হলেও পরিমাণের দিক থেকে তা আগের তুলনায় বেশি হতে পারে। আগের মোট পুঁজির শতকরা পঞ্চাশ থেকে এখনকার মোট পুঁজির শতকরা কুড়ি; পরিমাণের দিক থেকে হয়ত বেশি। মোট ১০০ পাউন্ড হলে আগের হিসাবে অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ এই হিসাবে শ্রমশক্তির জন্যে খরচ হবে ৫০ পাউন্ড; এখন পুঁজি ৫০০ পাউন্ড; শতকরা ২০ এই হিসাবে শ্রমশক্তির জন্যে খরচ ১০০ পাউন্ড। সুতরাং দেখা গেল, পরিবর্তমান পুঁজির হারের হ্রাস হলো, কিন্তু পুঁজি বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা আগে দেখিয়েছি, শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির জন্যে বৃহদায়তনে (on a large-scale) সমবায়ের প্রয়োজন। সমবায় সম্ভব হতে পারে ব্যক্তিগত পুঁজিগুলোর বৃদ্ধি দ্বারা। উৎপাদনের উপকরণ ও গ্রাসাচ্ছাদনের দ্রব্যসমূহ যতো বেশি পুঁজিপতির আয়ত্বে আসবে ততোই পুঁজির কলেবর বৃদ্ধি হবে এবং সমবায় সম্ভব হতে পারবে। সামাজিক পুঁজি বহু হাতে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলেও তার যে বৃদ্ধি হচ্ছে তাকে আমরা বলব কেন্দ্রীভূক্তি (concentration); কিন্তু প্রতিযোগিতার ফলে অনেক পুঁজিপতি ধ্বংস হলে, যখন এই পুঁজি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন তাকে আমরা বলব সংকেন্দ্রন (centralisation)। বহু হাতে পুঁজি ছড়িয়ে থাকে; ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতায় বহু পুঁজিপতির ধ্বংস থেকে দ্বিতীয়টার জন্ম হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটা জিনিসের উদ্ভব হয়, তাকে আমরা বলতে পারি ক্রেডিট ব্যবস্থা। প্রথমত তা পুঁজিবৃদ্ধির ও সংকেন্দ্রনের

সহায়ক হিসাবেই আবির্ভূত হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে বড় বড় পুঁজিপতিদের কাজে লেগে ক্রেডিট ব্যবস্থা ছোট ছোট পুঁজিপতিদের সম্পর্কে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এখন আমরা দেখতে পাই পুঁজিদার (Banker) ও পুঁজিপতি, উভয়েই মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক।

ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীভূত হওয়ায় পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি হলো না, যেগুলো নানাভাবে ছড়িয়ে ছিল, সেগুলোই কেন্দ্রীভূত ও একত্র হল, মোট পরিমাণ বাড়ল না। কিন্তু কেন্দ্রীভূত হওয়ার সমবায়িক উৎপাদনের আকার বাড়ল, তাতে পুঁজির বহু পরিমাণে বেড়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটল।

পুঁজির বৃদ্ধি হলো বটে কিন্তু তার ভিতরকার গড়নের ভেতর একটা গুণগত পরিবর্তনও দেখা দিল। পুঁজির অপরিবর্তমান অংশ ক্রমেই বাড়তে লাগল, অন্যদিকে পরিবর্তমান অংশটার হার ক্রমেই কমতে শুরু করল। প্রথমটার তুলনায় দ্বিতীয়টার অনুপাত কি হারে কমে তার একটা নিদর্শন উল্লেখ করছি। প্রথমে হয়তবা এদের অনুপাত ছিল একে এক, পরে তা হয়ে দাঁড়াল দুই এ এক, তিনে এক, চারে এক ইত্যাদি। পুঁজি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তির জন্যে আর অর্ধেক খরচ না হয়ে তিনভাগের একভাগ, চারভাগের একভাগ, পাঁচভাগের এক ভাগ এভাবে ব্যয় হতে লাগল। যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য খরচ হতে লাগল তিনভাগের দুইভাগ, চারভাগের তিনভাগ, পাঁচ ভাগের চারভাগ এভাবে। মোট পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবর্তমান অংশ বাড়ে বটে, কিন্তু আগের তুলনায় অল্প হারে। পুঁজিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা বাড়ছে, তাছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর জনসংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলছে; এসবের তুলনায়, যে সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ পুঁজিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে তা নিতান্তই কম, সুতরাং শ্রমিকদের ভেতর সব সময়ই একটা অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় অংশ অবশিষ্ট থাকে, একে বলা চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা (Surplues Population)। পুঁজিতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার এই অতিরিক্ত অংশ উত্তরোত্তর বাড়বেই। এই জনসংখ্যামূলক সূত্রটাকে পুঁজিতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত করে দেখতে হবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রসূত ঘটনা হলেও তা আবার পুঁজিতন্ত্রের প্রসারেরও একটা হেতু। শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ায় পুঁজিপতিরা ইচ্ছামতো তাদের কারখানায় নিযুক্ত করে শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে মুনাফা বাড়িয়ে নিতে পারে। তাছাড়া ইচ্ছেমতো কারখানার আয়তন বাড়াতে হলে ইচ্ছেমতো তারা শ্রমিকের নিয়োগ বাড়াতে পারে। এভাবে শ্রমিক সংখ্যার অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অংশ পুঁজিতন্ত্রের প্রসারের জন্যে একেবারেই অপরিহার্য।

এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা তিনটে আকারে অবস্থিত রয়েছে। বেকার অথবা অর্ধনিযুক্ত শ্রমিক মাত্রই এই পর্যায়ের লোক। যেখানে বড় বড় কারখানাগুলো অবস্থিত রয়েছে, সেখানে দেখা যায় কখনো বা শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে আবার কখনো বা আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নেয়া হচ্ছে। এখানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ভাসমান আকারে থাকে।

অনেকগুলো অটমেটিক কারখানায় দেখা যায়, পুঁজিপতিরা অল্প-বয়স্ক শ্রমিকদেরই সাধারণত নিযুক্ত করে থাকে। যেই তারা সাবালক ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে, অমনি তাদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়, তারা এই ভাসমান বেকার

সম্প্রদায়ের দল পুষ্ট করে। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনে শ্রমশক্তি এতো দ্রুত ক্ষয় হয় যে জীবনের অর্ধেক বয়সেই শ্রমিকেরা অকর্মণ্য হয়ে বেকার দল পুষ্ট করে। তাদের স্থান পূরণ করার জন্য মজুরদের অল্প বয়সে বিয়ে করতে হয়।

কৃষিকাজ পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়ার সাথে সাথে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। কারখানায় যেমন পুঁজিবৃদ্ধি হলে বেশি সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, কৃষিতে তেমন হয় না। তাই গ্রাম্য জনসংখ্যার একটা বিশেষ অংশ সব সময়ই শহর অভিমুখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে; তাতে শহুরে মজুরদের মজুরি হ্রাস পায়। গ্রামে সব সময়ই অতিরিক্ত সংখ্যার সম্ভাবনা থাকে, তাতে কৃষি মজুরদের মজুরিও সর্বনিম্ন কোঠায় গিয়ে পৌঁছে। এই প্রকারের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় অতিরিক্ত জনসংখ্যা (latent surplus population)।

এই অতিরিক্ত মজুর জনসংখ্যার একটা অংশ অচটুল (stagnant)। অংশটা কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের পর্যায়ভুক্ত বটে, কিন্তু তাদের কাজ সব সময় থাকে না। পুঁজিপতির ইচ্ছামতো তারা কাজ পেতে পারে; কারখানার মালিকের ইচ্ছার উপর তাদের নিয়োগ নির্ভর করে বলেই তাদের অল্প মজুরিতে বেশি সময় খাটানোর সুবিধা হয়।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার সর্বনিম্নস্তর একেবারে দারিদ্রে (Pauperism) বাস করে। এদের আবার তিনটে শ্রেণী আছে। প্রথমতঃ যারা কার্যক্ষম। দ্বিতীয়তঃ পিতৃমাতৃহীন কাঙ্গাল শিশু সন্তানেরা। তৃতীয়তঃ বয়োবৃদ্ধি এবং দুর্ঘটনাজনিত কারণে যারা কাজে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। পপারইজমকে বলা চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার একটা হাসপাতাল।

সমাজ-বিত্ত ও পুঁজি যতই বিস্তৃত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা যতোই বাড়বে, অতিরিক্ত মজুর জনসংখ্যাও সেই পরিমাণে না বেড়ে পারে না।

মুনাফার হার ও সংকট

উদ্বৃত্ত মূল্যের হার সম্পর্কে আমরা বিচার করেছি। পুঁজিপতি যে মূলধন খাটিয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশের সাথে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণের অনুপাত করে সে দেখতে চায় না। সে সমস্ত খাটানো মূলধনের সাথে তার উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত করে দেখবে। এই অনুপাতকেই বলা হয় মুনাফার হার। অপরিবর্তমান এবং পরিবর্তমান পুঁজির যোগফলই পুঁজিপতি কর্তৃক খাটানো সমগ্র পুঁজি; এই যোগফলটাকেই বলা যেতে পারে পণ্যের খরচ। কিন্তু পণ্যের মূল্য সব সময়ই পণ্যের খরচ থেকে বেশি। কেননা পণ্যের খরচের সাথে উদ্বৃত্ত-মূল্য যুক্ত হয়েই পণ্যের মূল্য হয়ে থাকে। যদি ৪০০ পাউন্ড হয় অপরিবর্তমান পুঁজি এবং ১০০ পাউন্ড পরিবর্তমান পুঁজি এবং আরো ১০০ পাউন্ড উদ্বৃত্ত মূল্য (শোষণের হার ১০০% হলে) তবে পণ্যের মোট মূল্য হবে ৬০০ পাউন্ড। এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই মুনাফা। এই মুনাফার মূল হলো এখানে যে পুঁজিপতি এমন একটা জিনিস বাজারে উপস্থিত করেছে যার উৎপাদনের

জন্যে তাকে কিছুই খরচ করতে হয়নি। পণ্যের মূল্য থেকে পণ্যের খরচকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা। খাটানো সমগ্র পুঁজির সঙ্গে এই উদ্বৃত্তমূল্যের বা মুনাফার অনুপাতকে $\frac{S}{C}$ এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

পুঁজিপতির সব সময়ই লক্ষ্য থাকবে পণ্য বিক্রির সময় তার বাজারদর যেন পণ্যের খরচের উপর থাকে। যদি এই খরচের নীচে বাজারদর নেমে আসে, তবে উৎপাদনের ভিতর যা সে খাটিয়েছে তা উঠবে না। এরূপ অবস্থার জন্যে পুঁজিপতি মনে করে পণ্যের খরচই বুঝি পণ্যের ভিতরকার মূল্য। তার ধারণা, বাজারে বাড়তি যা কিছু সে লাভ করে তা বুঝি বিনিময় থেকেই আসে।

আমরা আগেই দেখেছি, পরিবর্তমান পুঁজির সাথে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাতকে বলা হয় উদ্বৃত্ত মূল্যের হার। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের হারকে S/V রূপে প্রকাশ করা হয়। একই পরিমাণকে দুইভাবে অনুপাত করার জন্যে দুটো বিভিন্ন ফল দেখা দিয়েছে। উদ্বৃত্ত মূল্যেরই বাহ্যিক রূপ মুনাফা এবং মুনাফার হারই বাইরে প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু অদৃশ্যভাবে থাকলেও উদ্বৃত্তমূল্যের হারই যথার্থ সারবস্তু।

একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে মুনাফার হার এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, এই দু' এর সংখ্যাত্মক প্রভেদ থাকলেও মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য কিন্তু একই। মুনাফা উদ্বৃত্ত মূল্যেরই পরিবর্তিত রূপ; এই পরিবর্তিত রূপটা কোথা থেকে কি উপায়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদিত হয় তা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে। সুতরাং উদ্বৃত্ত মূল্যের আসল স্বরূপ বুঝতে হলে মুনাফা-রূপ আবরণটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। উদ্বৃত্ত মূল্যের ভেতরই আমরা পুঁজি এবং শ্রমের যথার্থ সম্পর্কটাকে পাই। কিন্তু পুঁজি—মুনাফার পরস্পর সম্পর্কের ভেতর বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই, তা যেন পুঁজিরই নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক। পুঁজিপতি উৎপাদনে যে পুঁজি খাটিয়েছে, বাজারে পণ্য বিক্রি করে যে লভ্যাংশ পাওয়া গেছে তাই মুনাফা; খাটানো পুঁজির বর্ধিতাংশ, লভ্যাংশকে উদ্বৃত্ত মূল্যরূপে না দেখে মুনাফা রূপে যখন দেখা হয় তখনই আসল সত্যটাকে রহস্যাবৃত করে রাখা হয় মাত্র।

উদ্বৃত্ত মূল্য অথবা মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে তিনটে জিনিসের উপর ঃ (১) শ্রম দিবসের দৈর্ঘ্য; (২) শ্রমের গাঢ়তা; (৩) মজুরি। মজুরি যদি বাড়ে তা হলে উদ্বৃত্ত মূল্য কমবে। কিন্তু অন্য দুটো যদি বাড়ে তাহলে উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়বে। ধরা যাক, মোট পুঁজি ১০০; শোষণের হার ১০০; অপরিবর্তমান পুঁজি ৮০ এবং পরিবর্তমান পুঁজি ২০। তাহলে উদ্বৃত্ত মূল্য হবে ২০। এটিকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে। ৮০C + ২০V + ২০S–এখানে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার ১০০%, মুনাফার হার ২০%।

শ্রমদিবস আগে ছিল ১০ ঘণ্টা, এখন যদি একে ১৫ ঘন্টায় বাড়ানো যায় এবং মজুরি আগের মতোই থাকে, তাহলে আগের ২০ জন শ্রমিক এখন মোট মূল্য উৎপাদন করবে ৪০ এর জায়গায় ৬০। মজুরি যেহেতু আগের মতোই রয়েছে, উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ এখন আগের কুড়ির জায়গায় হবে ৪০। সুতরাং শোষণের হার এখন হয়েছে ২০০% এবং মুনাফার হার ৪০%। শ্রম দিবস যদি ১০ ঘণ্টাই থাকে এবং মজুরি কমিয়ে ২০ এর বদলে হয় ১২, তবে মোট মূল্য এখন উৎপাদিত হবে ৪০-ই

বটে, কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ হবে ২৮। এই ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হলো ২৩৩.৩৩% এবং মুনাফার হার হলো ৩০.৪৩%।

তাহলে দেখা গেল, শ্রমদিবসের বৃদ্ধি, শ্রমের গাঢ়তার বৃদ্ধি এবং মজুরির হ্রাস উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই অবস্থাটা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে এই তিনটে পরিবর্তন পরিবর্তমান পুঁজি (V) এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের (S), এই দুটোর এবং এগুলোর অনুপাতের পরিবর্তন না ঘটিয়েই পারে না। এই পরিবর্তনের সঙ্গে মুনাফার হার অর্থাৎ মোট পুঁজির সাথে উদ্বৃত্তমূল্যের অনুপাতের ভিতরেও পরিবর্তন সংঘটিত না হয়েই পারবে না। একসঙ্গে সমস্ত পুঁজি খাটানো সম্ভব না। কেননা সমস্ত পুঁজি খাটিয়ে উৎপাদন হয়ত বা করা গেল। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় উৎপাদন কার্য শুরু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না; তাই কিছুটা পুঁজি হাতে রেখে যতটা পুঁজি খাটালে তাড়াতাড়িই উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হতে পারে, ততটাই খাটানো হয়। বাজারে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হয়ে পুনরায় পুঁজির উৎপাদনে প্রত্যাবর্তনকে বলা হয় 'টার্ন ওভার'। এই প্রত্যাবর্তনের সময় যতো কম হয়, ততোই পুঁজি হাতে পড়ে থাকবে কম; উদ্বৃত্ত মূল্য আসবে বেশি বেশি। উৎপাদন এবং বিক্রি যতো দ্রুত হবে, বছরে পুঁজির প্রত্যাবর্তনও ততো বেশি হবে। উৎপাদনের সময় কমতে পারে, শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির জন্যে; এই অবস্থাটাকে বলা হয় শিল্পের উন্নয়ন। বিক্রির সময় হ্রাস পেতে পারে উন্নততর যানবহনের প্রচলনের জন্য।

এখন দেখা যাক, কম সময়ে উৎপাদন এবং বিক্রির জন্যে অর্থাৎ পুঁজির অধিক প্রত্যাবর্তন হেতু (turnover) কি করে মুনাফা বৃদ্ধি হয়। মোট পুঁজি ধরা যাক ১০০; C = ৮০; V = ২০; উদ্বৃত্ত মূল্যের হার ১০০%। প্রতি বছরে এই পুঁজি প্রত্যাবর্তন হয় দুইবার অর্থাৎ টার্নওভার ২। পুঁজি বছরে দুইবার কাজ করলে ৮০C + ২০V + ২০S এর জায়গায় মোট পণ্যের মূল্য হবে ১৬০C + 80V + 80S। এই ক্ষেত্রে মুনাফার হার নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা উদ্বৃত্ত মূল্য ৪০ কে ২০০-র (১৬০C + 80V) সাথে অনুপাত করব না। এর অনুপাত হবে আসল পুঁজি ৮০C + ২০V = ১০০ এর সাথে, এই অবস্থায় মুনাফার হার হল ৪০%।

সুতরাং দেখা গেল যে, দুটো পুঁজির অপরিবর্তমান এবং পরিবর্তমান অংশের অনুপাত (Organic composition) যদি একই হয়, শোষণের হার যদি সমান হয়, শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্যও যদি একই হয়, দুটো পুঁজির মুনাফার হারের ব্যতিক্রম হবে তাদের টার্ন ওভার অনুসারে। এটি সহজেই অনুমেয় যে পাঁচশত পাউন্ডের পরিবর্তমান পুঁজি বছরে দশবার ঘুরে আসলে তা থেকে যে মুনাফার সৃষ্টি হবে তা বছরে একটা টার্ন-ওভার বিশিষ্ট পাঁচ হাজার পাউন্ডের পুঁজির মুনাফার সমান। ধরা যাক, একটা মোট পুঁজির যে অংশটা যন্ত্রপাতি, তার পরিমাণ– ১০০০০; এর বার্ষিক ক্ষয়ের (wear and tear) হার শতকরা ১০। অপরিবর্তমান পুঁজির যে অংশটা কাঁচামাল ইত্যাদি তার পরিমাণ ৫০০; পরিবর্তমান পুঁজি ৫০০। উদ্বৃত্ত মূল্যের হার শতকরা ১০০। সহজেই বোধগম্য হওয়ার জন্যে ধরা যাক যেন পরিবর্তমান পুঁজি যে

সময়ে এবং যতোবার প্রত্যাবৃত হয়, সেই সময়ে অপরিবর্তমান পুঁজির যে অংশটা কাঁচামাল তাও ততোবারই প্রত্যাবৃত হয়। এই অবস্থায় একটা প্রত্যাবর্তনের যে মোটফল দেখা দেবে তা নিম্নরূপ ঃ

১০০C (ক্ষয়াংশ) + ৫০০C + ৫০০C + ৫০০C = ১৬০০। বার্ষিক টার্ন ওভার যদি হয় ১০, তবে মোটফল হবে ১০০০C (ক্ষয়াংশ) + ৫০০০C + ৫০০০V + ৫০০০S = ৬০০০ এই ক্ষেত্রে মোট C+V হলো ১০০০C + ৫০০০C + ৫০০০V = ১০০০০; S = ৫০০০; সুতরাং মুনাফার হার (P) = $\frac{৫০০০}{১১০০০} = ৪৫\frac{৫}{১১}\%$।

সমগ্র পুঁজির ভিতরে অপরির্বমান পুঁজির অংশই বেশি; সুতরাং অপরিবর্তমান পুঁজি অথবা C যতই বাড়বে মুনাফার হার ততোই কমবে। অবশ্য এও সত্য যে অপরিবর্তমান পুঁজির বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তমান পুঁজিও বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণও বাড়বে। তাই পুঁজিপতির সব সময়ই চেষ্টা থাকে যাতে অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্য কমানো সম্ভব হতে পারে। পুঁজিপতির প্রথম চেষ্টা থাকে, শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দেয়া। তাহলে আগের একই সংখ্যক শ্রমিক ও যন্ত্রপাতি দিয়ে আরো বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করবে। বাড়তি শ্রমিক নিয়োগ করতে হলো না, যন্ত্রপাতি এবং বাড়িঘর বাড়াতে হলো না। শ্রমিককে অতিরিক্ত খাটুনির জন্যে অতিরিক্ত মজুরিও যদি দেয়া হয়, তাহলেও পুঁজিপতির কোন ক্ষতি নেই; কেননা বাড়তি উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন সম্ভব হলো অথচ অপরিবর্তমান পুঁজির যে অংশটা যন্ত্রপাতি এবং বাড়িঘর, তা আগের মতোই রয়ে গেল।

শ্রমদিবস যদি বাড়ানো সম্ভব না হয়, তখন কি হবে? শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ালে যন্ত্রপাতিও বাড়াতে হবে, অথবা ভাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করে শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়ে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমনই হোক, অপরিবর্তমান পুঁজির যে অংশ যন্ত্রপাতি এবং যে অংশ কাঁচামাল দুই-ই বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় মুনাফার হার কমবেই। তখনই পুঁজিপতি চেষ্টা করবে নানা উপায়ে ব্যয় সংকোচন করে অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্য কমিয়ে নিতে; কিন্তু এরূপ ব্যয় সংকোচন করতে গিয়ে শ্রমিকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তার মোটেও বাধে না। সংকীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বহু শ্রমিককে একসঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হয়, তারই একপাশে হয়ত বা মারাত্মক একটা যন্ত্র স্থাপন করা হল। একে পৃথক ঘরে রেখে শ্রমিকের জীবনকে নিরাপদ রাখার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন সে বোধ করে না।

ধরা যাক, ক এবং খ দুটো বিভিন্ন প্রকারের উপাদান। দুটোরই মোট পুঁজি ৭০০। ক-এ পরিবর্তমান পুঁজি (v) ১০০; সুতরাং অপরিবর্তমান পুঁজি (C) ৬০০। খ-এ পরিবর্তমান পুঁজি (V) ৬০০; সুতরাং অপরিবর্তমান পুঁজি (C) = ১০০। শোষণের হার যদি দুটোতেই ১০০% হয় তবে প্রথমটাতে উদ্বৃত্ত মূল্য হবে ১০০,

দ্বিতীয়টাতে ৬০০। এই অবস্থায় ক-এ মুনাফার হার $\frac{১০০}{৭০০} = \frac{১}{৭} = ১৪\frac{২}{৭}\%$; খ-এ মুনাফার হার $\frac{৬০০}{৭০০} = \frac{৬}{৭} = ৮৫\frac{৫}{৭}\%$। এ থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সব উৎপাদনের 'অর্গানিক কম্পোজিশন' কম সেখানে মুনাফার হার বেশি, যেখানে 'অর্গানিক কম্পোজিশন' বেশি, মুনাফার হার সেখানে কম। ক-এ অপরিবর্তমান পুঁজির সাথে পরিবর্তমান পুঁজির অনুপাত ১০০ ঃ ৬০০ = ১ ঃ ৬; খ-এ এই অনুপাত ৬০০ ঃ ১০০ = ৬ ঃ ১। তাহলে দেখা গেল যে, অর্গানিক কম্পোজিশনের বিভিন্নতার জন্যেই একই পরিমাণের পুঁজি বিভিন্ন উৎপাদনে বিভিন্ন মুনাফার হার সৃষ্টি করেছে। একই পরিমাণের দুটো পুঁজি একই পরিমাণে মুনাফা সৃষ্টি করবে যখন শুধু তাদের অর্গানিক কম্পোজিশন সমান হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করার রয়েছে, অর্গানিক কম্পোজিশনের তারতম্য সত্ত্বেও যদি মোট পুঁজি সমান হয়, তবে দুটো উৎপাদনের মুনাফা এবং মুনাফার হার বিভিন্ন হবে বটে কিন্তু উৎপাদনের খরচ (cost price) একই হবে। ৯০C + ১০V অথবা ১০C + ৯০V—এই দুই ক্ষেত্রেই পণ্য তৈরির খরচ একই : দুই ক্ষেত্রেই এর পরিমাণ ১০০। এই সমতাই হলো পুঁজিতে পুঁজিতে প্রতিযোগিতার ভিত্তি, এ থেকেই সৃষ্টি হয় গড়পড়তা মুনাফার হার (average rate of profit)।

পাঁচটি বিভিন্ন উৎপাদনের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। প্রত্যেকটার পুঁজিরই অর্গানিক কম্পোজিশন বিভিন্ন।

পুঁজি	উদ্বৃত্ত মূল্যের হার	উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ	দ্রব্যের মূল্য	মুনাফার হার
(১) ৮০C + 20V	১০০%	২০	১২০	২০%
(২) ৭০C + ৩০V	১০০%	৩০	১৩০	৩০%
(৩) ৬০C + ৪০V	১০০%	৪০	১৪০	৪০%
(৪) ৮৫C + ১৫V	১০০%	১৫	১১৫	১৫%
(৫) ৯৫C + ৫V	১০০%	৫	১০৫	৫%

উপরের পাঁচটি পুঁজির উদ্বৃত্তমূল্যের হার এক হলেও তাদের অর্গানিক কম্পোজিশনের বিভিন্নতার জন্যে মুনাফার হারও বিভিন্ন হয়েছে। পাঁচটি পুঁজির যোগফল ৫০০; উদ্বৃত্তমূল্যের যোগফল ১১০; উৎপাদিত দ্রব্যের মোট মূল্য ৬১০। এই ৫০০ কে যদি আমরা একটা পুঁজি হিসাবেই দেখি, তাহলে এর গরপড়তা গড়ন হবে ৩৯০C + ১১০V; শতকরা হিসাবে দেখালে তা দাঁড়ায় ৭৮C + ২২V। অর্থাৎ যদি প্রত্যেক একশকে পাঁচশ-এর এক পঞ্চমাংশ হিসাবে ধরা যায়, তবে প্রত্যেকটার গড়পড়তা গড়ন হবে ৭৮C + ২২V; তাহলে প্রত্যেক একশতে গড়পড়তা মুনাফার হার হবে ২২%। তাছাড়া মোট উৎপাদিত দ্রব্যের প্রত্যেক পঞ্চমাংশের বাজারদর হবে ১২২।

পুঁজি	উদ্বৃত্ত মূল্যের হার	উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ	মুনাফার হার	পরিবর্তমান পুঁজির যে অংশ খরচ হয়েছে (used-up)	উৎপাদিত দব্যের মূল্য (value of commod ities)	উৎপাদনের খরচ (cost-price)
(১) ৮০C + ২০V	১০০%	২০	২০%	৫০	৯০	৭০
(২) ৭০C + ৩০V	১০০%	৩০	৩০%	৫১	১১১	৮১
(৩) ৬০C + ৪০V	১০০%	৪০	৪০%	৫১	১৩১	৯১
(৪) ৮৫C + ১৫V	১০০%	১৫	১৫%	৪০	৭০	৫৫
(৫) ৯৫C + ৫V	১০০%	৫	৫%	১০	২০	১৫
৩৯০C + ১১০V		১১০	১০০%			
৭৮C + ২২V		২২	২২%			

উপরের লেখটাতে আমরা উৎপাদন খরচের একটা ঘর দেখিয়েছি। এর প্রত্যেকটার সাথে গড়পড়তা উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ ২২ যোগ করলেই আমরা পাব উৎপাদনের বাজার-দর (Price of production)।

পুঁজি	উদ্বৃত্ত মূল্য	দর	উৎপাদন খরচ (cost-price of commodi ties)	দ্রব্যের বাজার দর (Price of commodities)	মুনাফার হার	মূল্য থেকে বাজার দরের বিচ্যুতি (Deviation of price from value)
(১) ৮০C + ২০V	২০	৯০	৭০	৯২	২২%	+২
(২) ৭০C + ৩০V	৩০	১১১	৮১	১০৩	২২%	-৮
(৩) ৬০C + ৪০V	৪০	১৩১	৯১	১১৩	২২%	-১৮
(৪) ৮৫C + ১৫V	১৫	৭০	৫৫	৭৭	২২%	+৭
(৫) ৯৫C + ৫V	৫	২০	১৫	৩৭	২২%	+১৭

এখানে একটা বিষয় বিবেচ্য। আমরা আগের দৃষ্টান্তে ধরে নিয়েছি যে অপরিবর্তমান পুঁজির সবটাই একটা টার্ন-ওভারেই নিশেষিত হয়। কোন কোন সময়ে তা সম্ভব হলেও যেখানে অপরিবর্তমান পুঁজি পরিবর্তমান পুঁজি থেকে বহু গুণ বড়, সেখানে যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরেই ক্ষয় হবে।

এই বিচ্যুতির হিসাব নিলে দেখা যায় যে, উৎপাদিত দ্রব্যগুলো এক ক্ষেত্রে মূল্যের ২ + ৭ + ১৭ = ২৬ উপরে বিক্রি হচ্ছে, অন্যক্ষেত্রে ৮ + ১৮ = ২৬ নিচে বিক্রি হচ্ছে। বাজার দর এক ক্ষেত্রে মূল্যের যতোটা উপরে গেছে, অন্য ক্ষেত্রে ততখানি নিচে নেমেছে; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পাঁচটা পুঁজি থেকে যে মূল্য সৃষ্টি হয়েছিল বাজারে তাই উঠিয়ে নেয়া গেল। এই বিচার থেকে দেখা গেল, দ্রব্যের বাজারদর দ্রব্যের উৎপাদন খরচ এবং গড়পড়তা মুনাফার সমষ্টির সমান।

বিভিন্ন উৎপাদনে পৃথক পৃথক মুনাফার হারকে গড়পড়তা মুনাফার হারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সমান করে দেয়। কোন পুঁজিই তার নিজের উৎপাদনের ভেতর যে উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা সৃষ্টি হয় তাই আত্মাসাৎ করতে পারে না। সমাজের সব পুঁজি খাটিয়ে পুঁজিপতিরা যে উদ্বৃত্ত মূল্য অথবা মুনাফা সৃষ্টি করে তারই একটা

অংশ সমাজের মোট পুঁজির প্রতি শতাংশের ভাগে পড়ে। অর্গানিক কম্পোজিশন যাই হোক, যে কোন উৎপাদনেই যে পরিমাণ পুঁজিই খেটেছে তার প্রতি শতাংশের মুনাফার হার একই হবে। পুঁজিপতিরা যেন একটা স্টক কম্পানীর শেয়ার হোল্ডার, প্রতিটি শেয়ারের মূল্য একশ, যার বেশি শেয়ার তার ভাগে পড়ে ততো বেশি পরিমাণ মুনাফা। মুনাফার হারের ব্যতিক্রম হচ্ছে না। যে যতো বেশি পুঁজি খাটিয়েছে তার সেই অনুপাতেই বেশি মুনাফা লাভ হচ্ছে। প্রত্যেক মালিকেরই উৎপাদন খরচ তার নিজের; কিন্তু এই খরচের সাথে যে মুনাফা যুক্ত হচ্ছে তার উদ্ভব সম্পূর্ণই সামাজিক উৎপাদনে যে মুনাফা সৃষ্টি হয়, এই মুনাফা তা নয়। দশ রকম পুঁজির মুনাফার গড়পড়তা হিসাব নিয়েই এই মুনাফার সন্ধান পাওয়া যায়। এই মোট খাটানো পুঁজির প্রত্যেক শতাংশের একটা গড়পড়তা পরিমাণ।

সাধারণ ধারণা, যে উৎপাদনে অপরিবর্তমান পুঁজির (C) পরিমাণ বেশি হয়, মুনাফাও তারই বেশি হবে। কিন্তু আমাদের বিচারে পরিষ্কারই দেখা গেল যে, এরূপ উৎপাদনে পরিবর্তমান পুঁজির (v) অংশ কম বলে মুনাফাও এখানে কম। পূর্বোক্ত লেখগুলোতে যে উৎপাদনগুলোর অর্গানিক কম্পোজিশন উচ্চ, সেগুলোর মুনাফা কম। কিন্তু গড়পড়তা হিসাব কষে দেখা গেল যে দ্রব্যের বাজার দর যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে মুনাফার হার এগুলোতেই আপন আপন উৎপাদনের ভেতর সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য এবং মুনাফার হার থেকে বেশি। পূর্বাক্ত লেখগুলোর ৫ নং এ পুঁজিতে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৫, অথচ গড়পড়তা হিসাব কষে দেখা গেল বাজার দর যা হয়েছে তাতে উদ্বৃত্ত মূল্য ২২। বিভিন্ন উৎপাদনের ভেতর অর্গানিক কম্পোজিশন যাই হোক না কেন, প্রত্যেক শতাংশ পুঁজির লভ্যাংশ হার সমান হতে হবে।

একটা বিশেষ প্রকারের উৎপাদনের ভেতর বিভিন্ন পুঁজির উৎপাদিত দ্রব্যগুলোর মূল্য যাই হোক না কেন, তাদের বাজার দর নির্ধারিত হবে সমাজ নির্ধারিত শ্রম সময় দ্বারা। আবার বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের ভেতর পুঁজির প্রতিযোগিতা উৎপাদনের বাজার দর ঠিক করে তাদের ভাগে সমান মুনাফার হার নির্ধারিত করে দেয়। উৎপাদনের বাজার দর কি করে ঠিক হয়, তা আমরা আগেই দেখেছি। উৎপাদনের খরচের সাথে গড়পড়তা মুনাফা যোগ দিলেই আমরা উৎপাদনের বাজার দর পেয়ে থাকি।

আমরা আগেই দেখেছি যন্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নয়নের সাথে সাথে পুঁজির পরিমাণ খুবই বেড়ে যাচ্ছে। এই মোট পুঁজির ভিতরে আবার যে অংশ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তাদের বৃদ্ধি হচ্ছে বেশি। পরিবর্তমান পুঁজিও (v) ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার পরিমাণ বাড়লেও অপরিবর্তমান পুঁজির বৃদ্ধি অনুপাতে পরিবর্তমান পুঁজি কম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে হয়তবা পরিবর্তনমান পুঁজি ছিল ৪০, এখন মোট পুঁজি দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায় পরিবর্তমান পুঁজি হল ১০০; কিন্তু অপরিবর্তমান পুঁজি আগের ৬০-এর জায়গায় হলো ১০০। এই ক্ষেত্রে অপরিবর্তমান পুঁজি দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে কিন্তু পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ বাড়লেও তার বৃদ্ধি দ্বিগুণ হয়নি। ৬০C + ৪০V-এ (শোষণের হার ১০০%) মুনাফার হার হলো ৪০% কিন্তু ১৩০C + ৭০V এ মুনাফার হার ৩৫%। এই বিচার থেকে পরিষ্কার দেখা গেল শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে অপবিরর্তমান পুঁজি বাড়লে, পরিবর্তমান পুঁজির মোট পরিমাণ বাড়লেও তার আপেক্ষিক হ্রাসের জন্যে মুনাফার হার কমে যায়।

এই সূত্র এতো সহজ হলেও অর্থনীতির পণ্ডিতরা তার কারণ উদ্ধার করে উঠতে পারেন নি। C ঃ V = ৫০ ঃ ১০০ হলে শোষণের হার (১০০%) ৬৬ $\frac{২}{৩}$% মুনাফার হারের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। অথচ C ঃ V = ৪০০ ঃ ১০০ হলে একই শোষনের হার ২০% মুনাফার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়।

পরিবর্তমান পুঁজির আপেক্ষিক হ্রাস এবং অপরিবর্তমান পুঁজির আপেক্ষিক বৃদ্ধিতে বর্ধিত উৎপাদন শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। একটার আপেক্ষিক বৃদ্ধি এবং অন্যটার আপেক্ষিক হ্রাস হলেও দুয়েরই মোট পরিমাণের বৃদ্ধি হয়।

উপরোক্ত বিচারে দেখা গেল যে, আপেক্ষিক হ্রাস হলেও পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে; সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার হার কমছে বটে কিন্তু মুনাফার পরিমাণ বাড়ছে। এই বৃদ্ধির দরুণ পুঁজিপতির হাতে পুঁজির সঞ্চয় (Accumulation) উত্তরোত্তর বাড়ছে। মুনাফার হার কমছে দেখে সকল পুঁজিপতিরাই তখন চেষ্টা করবে অধিকতর পুঁজি খাটিয়ে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে, বেশি পুঁজি খাটানোর জন্য আগে থেকে বেশি শ্রমিক এখন নিযুক্ত হবে বটে কিন্তু এই বৃদ্ধির হার অপরিবর্তমান পুঁজির বৃদ্ধির হার থেকে অপেক্ষাকৃত কম। এই অবস্থায় একটা আপেক্ষিক অতিরিক্ত জনসংখ্যার (relative surplus population) সৃষ্টি হয়। পরিবর্তমান পুঁজি যদি বেশি না হয়ে মোট পুঁজির এক ষষ্ঠাংশ হয় তাহলে আগের শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করতে হলে মোট পুঁজিকে আরো দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। শ্রমশক্তি যদি দ্বিগুণ করা যায় তবে মোট পুঁজি আরো ছয়গুণ বাড়াতে হবে ; সুতরাং মোট পুঁজি ও এর অপরিবর্তমান অংশ যে হারে বৃদ্ধি পায়, পরিবর্তমান পুঁজি বা শ্রমশক্তি সেই অনুপাতে বাড়তে পারে না।

মুনাফার হার যে ক্রমেই কমছে এই সমস্যাটার সমাধান মার্কস ছাড়া অন্য কোন অর্থনীতিবিদ করতে পারেনি। মুনাফার হার কমে একেবারেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে না কেন, এই সমস্যাটা একমাত্র মার্কসই সমাধান করেছেন। মুনাফার হার কমছে দেখে পুঁজিপতিরা এর নিম্নাভিমুখী গতিকে ঠেকাতে চেষ্টা করেন। তাদের প্রথম চেষ্টা শোষণের হার বৃদ্ধি করা, তাহলে মুনাফার পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। এই শোষণের হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে দুই উপায়ে—শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্য বাড়ানো, শ্রমের গাঢ়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে আপেক্ষিক উদ্বৃত্তমূল্য অর্জন। উদ্বৃত্ত মূল্যের অথবা মুনাফার পরিমাণ যতই বাড়ানো সম্ভব হবে ততই মুনাফার হারের নিম্নাভিমুখী গতিকে খানিকটা ঠেকানো যেতে পারে। শ্রমশক্তির যথার্থ মূল্যের নীচে মজুরি দিয়েও মুনাফা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে অপরিবর্তমান পুঁজির আয়তন (volume) যে হারে বাড়ছে, তার মূল্য সেভাবে বাড়ে না। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে সব জিনিসেরই মূল্য কমে, সেই হিসাবে অপরিবর্তমান পুঁজিরও মূল্য কমছে। শিল্পে অপরিবর্তমান পুঁজির অংশ দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় কি ভাবে যে অতিরিক্ত বেকার জনসংখ্যার সৃষ্টি হচ্ছে আগেই তা আমরা দেখেছি। জনসংখ্যার বাহুল্যের জন্যে এই সময়ে নতুন নতুন উৎপাদন দেখা দেয়। এই উৎপাদনগুলো গোড়ায় অল্প মজুরিতে বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে। এক কথায় অপরিবর্তমান (C) হতে পরিবর্তমান (V) পুঁজির অংশই এই সব উৎপাদনে বেশি থাকে। এই কারণে এই সব উৎপাদনে মুনাফার হার বেশি। কিন্তু গড়পড়তা মুনাফার হার ঠিক হয় সব

উৎপাদনগুলোকে এক করে। কতগুলো উৎপাদন মুনাফার হার বেশি হওয়ায় গড়পড়তা মুনাফার খুব বেশি নীচের দিকে নামতে পারে না। বিদেশে এবং উপনিবেশগুলোতে পুঁজি খাটিয়ে অধিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব হয়। উপনিবেশগুলোতে মজুর সস্তা, তাই সেখানে পুঁজির পরিবর্তমান অংশই বেশি, মুনাফার হারও বেশি। গড়পড়তা মুনাফার হার এই কারণে বেশি নামতে পারে না। মুনাফার হার কেন কমে এবং কেনই বা তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় না তার কারণ আমরা নির্ণয় করলাম। পরিশেষে, একটা বিষয় এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে, শোষণের হার বৃদ্ধি এবং মুনাফার হার হ্রাস-এই দুটো সত্য শ্রমের উৎপাদন শক্তি যে পুঁজিতান্ত্রিক প্রকাশ চায় তারই অন্তর্ভুক্ত। সাধারণভাবে আমরা অনুমান করি, উৎপাদন শক্তি কমার জন্যেই বুঝি মুনাফার হার হ্রাস পায়। কিন্তু আসল সত্যি তার বিপরীত। উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায় বলেই মুনাফার হার হ্রাস পায়।

মুনাফার হার হ্রাস এবং সঞ্চয়ের (accumulation) বৃদ্ধি একই প্রক্রিয়ার বহি প্রকাশ। এই দুটোই উৎপাদন শক্তি যে বেড়েছে তাই সূচিত করে। সঞ্চয় বেশি হলে মুনাফার হার আবার কমবেই, কেননা এই সঞ্চয় খাটালেই অধিক পরিবর্তমান পুঁজি এবং ততোধিক অপরিবর্তমান পুঁজি খাটাতে হবে। এদিকে আবার মুনাফার হার কমলে পুঁজির আয়তন বৃদ্ধি এবং ছোট ছোট পুঁজিপতিদের ধ্বংশ করে পুঁজির কেন্দ্রীভুক্তি (Centralisation) বাড়বে। এই প্রক্রিয়ায় সঞ্চয় বাড়ছে সত্যিই, কিন্তু মুনাফার হার কমার সাথে সাথে সঞ্চয়ের হারও (Rate of accumulation) কমছে।

এদিকে আবার মোট পুঁজির আয়তনের বৃদ্ধির হার (rate of self expanison of total Capital) অর্থাৎ মুনাফার হার কমার সাথে সাথে নতুন বহুল উৎপাদন (over production) দালালবৃত্তি (speculation) সংকট, বহুল পুঁজি (surplus capital) এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা (surplus population) প্রভৃতি সামাজিক ঘটনা আত্মপ্রকাশ করে।

পুঁজির বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। কারখানায় শ্রমিককে শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করলে তবে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত মূল্য হাতে পাবে। উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা এবং মুদ্রারূপে সেই মূল্য হাতে পাওয়া এক কথা না। প্রথমটার সৃষ্টি হয় উৎপাদনের ভেতর, দ্বিতীয়টা সংঘটিত হয় বাজারে। সমস্ত পণ্য বাজারে বিক্রি হওয়া চাই, কেননা এই পণ্যের মোট মূল্যের ভেতর রয়েছে অপরিবর্তমান পুঁজি, পরিবর্তমান পুঁজি এবং উদ্বৃত্তমূল্য। যদি তা না হয় অথবা অংশত হয় অথবা এমন মূল্যে বিক্রি হয় যে, উৎপাদনের বাজার দর উঠে না আসে তবে শ্রমিককে শোষণ করা সত্ত্বেও তা থেকে মালিক আশানুরূপ লাভ করতে পারল না। এমনও হতে পারে যে, সে কোন উদ্বৃত্ত মূল্যই পেল না বা অংশত পেল। প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের ভেতরে শোষণ করা এবং বাজারে উদ্বৃত্ত মূল্যকে মুদ্রায় পরিবর্তিত করা দুটো সম্পূর্ণই ভিন্ন জিনিস। যুক্তির দিক থেকে যেমন দুটো বিভিন্ন, তেমন সময় ও দেশ (time and space) দিয়েও দুটো বিষয় পৃথকীকৃত। উৎপাদন নির্ভর করে সমাজের উৎপাদন শক্তির উপরে কিন্তু বাজারে বিক্রি নির্ভর করে বিভিন্নরূপ উৎপাদনের আনুপাতিক (Proportional) সম্বন্ধ এবং সমাজের ভোগ শক্তির (consuming) উপর। ভোগশক্তি হিসাবে ভোগশক্তির

কথা হচ্ছে না; যে ভোগশক্তির কথা হচ্ছে তা সব সময়ই নির্দেশিত হবে পরস্পর বিরোধী বণ্টনাত্মক সম্পর্কগুলো (antagonistic conditions of distribution) দ্বারা। এই ভোগশক্তি একটা সর্বনিম্ন পরিবর্তমান পুঁজিতেই সীমাবদ্ধ হয়। শুধু পরিবর্তমান পুঁজিই ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে শ্রমিকের ক্রয়শক্তি হ্রাস করছে তাই না, পুঁজিপতিরাও বেশি মুনাফা সৃষ্টির জন্যে নিজের সম্ভোগের খরচ কমিয়ে মুনাফার বেশি অংশ পুঁজি হিসাবে খাটাতে মনোযোগী হচ্ছে। এভাবে খাটানো পুঁজির পরিমাণ বাড়ার সথে সাথে যেমন উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বাড়ছে, তেমন মানুষের ক্রয়শক্তিও সংকীর্ণ হচ্ছে। পুঁজিতন্ত্রের এই স্ববিরোধী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটো জিনিস; একদিকে পুঁজির বাহুল্য, অন্যদিকে প্রয়োজনতিরিক্ত জনসংখ্যা। এই কারণেই পুঁজিতন্ত্রের বিরোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। শ্রমিককে কম শোষণ করা হচ্ছে তাই মুনাফার হার কমেছে, তা নয়, খাটানো পুঁজির আয়তন বাড়ার সাথে সাথে সেই অনুপাতে কম শ্রমিককে খাটানো হচ্ছে—এটাই সব সমস্যার মূল।

পুঁজিতন্ত্রের এই সব অন্তর্দ্বন্দ্ব সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে সংকটের (crisis) মধ্য দিয়ে। পুঁজিতন্ত্রের ধর্মই হলো উৎপাদনশক্তিকে (Productive forces) চরমভাবে বিকশিত করা। কিন্তু যে সব উপায়ের মধ্যে দিয়ে এই বিকাশ সম্ভব হয় তার একটা হলো মুনাফার হারের হ্রাস। তাকে অতিক্রম করতে গিয়ে পুঁজি নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। আসল কথা, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার যথার্থ শত্রু স্বয়ং পুঁজি। অধিক থেকে অধিকতর উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি দ্বারা পুঁজি আত্মপ্রসারণ সংঘটিত করতে গিয়ে সৃষ্টি করে ঃ (১) মুনাফার হারের হ্রাস; (২) পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অত্যাধিক সঞ্চয় (Accumulation) (৩) আপেক্ষিক প্রয়োজনাতিরিক্ত জনসংখ্যা; (৪) ক্রয়শক্তির হ্রাস।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার একমাত্র উদ্দেশ্য পুঁজির আত্মপ্রসারণ অর্থাৎ উৎপাদন করা হয় পুঁজির জন্যেই; উৎপাদনের উদ্দেশ্য কখনো যারা উৎপাদন করে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ নয়। কিন্তু পুঁজির জন্যে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সংঘটিত করতে গিয়ে পুঁজি অধিকাংশ লোককে নিরন্ন সিঃসহায় না করে পারে না। তখনই উৎপাদন অচল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পুঁজির প্রসারের পথে অন্তরায়গুলো উৎপাদন প্রথার সাথে বিরোধিতা শুরু করে দেয়।

পুঁজির প্রাচুর্য এমনভাবে বাড়তে থাকে যে একটা সময় দেখা যায় এতো পুঁজি উৎপাদনে খাটানো আর সম্ভব হয় না। এই পুঁজির একাংশ তখন খাটতে শুরু করে অনুৎপাদনের যেমন– স্পেকুলেশন, দালানী ইত্যাদিতে। একদিকে যেমন পুঁজির প্রাচুর্যের সাথে দেখা দিয়েছে বেকার পুঁজি, তেমনি অন্যদিকে দেখা দিয়েছে আপেক্ষিক অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্যে বেকার শ্রমিক।

এমন অবস্থায় পুরনো পুঁজির একাংশকে অকর্মণ্য না থেকে উপায় নেই। এই অকর্মণ্য পুঁজির পরিমাণ যে কি হবে তা নির্ধারণ করবে প্রতিযোগিতামূলক সংঘর্ষ। যতোক্ষণ শিল্প ব্যবসার জগতে সুসময়, পুঁজিতন্ত্র ততোক্ষণ পুঁজিপতিদের ভেতর সৌভ্রাত্র্য স্থাপন করে রাখে। সবাই তখন গড়পড়তা মুনাফার হার নিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু যখনই আর মুনাফার উপর ভাগ বসানোর কথা থাকে না, সবাই লোকসান দেয়, প্রত্যেকে চেষ্টা করে তার লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে।

যেমনই হোক শ্রেণী হিসাবে পুঁজিপতিরা লোকসান না দিয়ে পারে না। সেই প্রতিযোগিতা সুসময়ের সৌভ্রাতৃত্ব্য ভেঙ্গে দিয়ে পরস্পরকে পরস্পরের শত্রু হিসাবে দাঁড় করায়। এই প্রতিযোগিতায় দেখা যায় এক অংশ পুঁজি হয়ত বা নিষ্ফলই হয়ে দঁড়িয়েছে, অন্য অংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

এই যে পুঁজির ধ্বংশ হলো, এর কারণ পুঁজির অর্থাৎ যন্ত্রপাতির বাহুল্য। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এই বাহুল্য পুঁজি হিসাবেই বাহুল্য, অন্য রকম সমাজ ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতির বাহুল্য মোটেই বাহুল্য নয়। তা হলে দেখা গেল, উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা বেড়েছে, বাজারের পরিসর বেড়েছে, পুঁজির সঞ্চয় বেড়েছে, মুনাফার হার কমেছে, আর প্রয়োজনাতিরিক্ত জনসংখ্যার সৃষ্টি হয়েছে।

পুঁজির সঞ্চয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মুনাফার হারের হ্রাস থেকেই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। কেউ যেন মনে না করেন যে মুনাফার হার হ্রাস হয় প্রতিযোগিতার জন্যে। সমগ্র পুঁজির বেলায় অথবা কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বেলায়ই বলা যেতে পারে যে মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ায় যে ক্ষতি হলো তার পূরণ হয় ক্রমবর্ধমান মুনাফার পরিমাণ দ্বারা। কিন্তু অত্যধিক পুঁজির সৃষ্টির জন্যে নতুন নতুন পুঁজি যে সব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করল, তাদের বেলায় এই মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা ক্ষতিপূরণ করার কথা ওঠে না। তারা শুরু করে গোড়া থেকে। পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলো অপেক্ষা এই সব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অপেক্ষাকৃত বেশি নিয়োগ হবে, সুতরাং মুনাফার হার এই সব প্রতিষ্ঠানে হবে বেশি। ঠিক এই কারণেই কিছু কালের জন্যে মজুরের চাহিদাও বাড়বে বেশি; কিন্তু মজুরি বাড়ায় মুনাফার হারও আবার কমবে।

সুতরাং দেখা গেল যে পুঁজিতন্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষের অভাব মিটানোর জন্যে উৎপাদন করা না, উদ্দেশ্য মুনাফা-সৃষ্টি। বর্তমান উৎপাদন প্রথায় দ্রব্যোৎপাদন যথেষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু মানুষের সব রকম অভাব মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট না। কখনো এটি সত্যি না যে এতো বেশি যন্ত্রপাতি উৎপাদন হয়েছে যে সমাজে উৎপাদনের উপযোগী যে মানুষ রয়েছে তাদের কাজ দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

আসল কথা কয়েক বছর পরপর দেখা যায় যে এতো বেশি উৎপাদনের যন্ত্র এবং ব্যবহারযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে যে একটা বিশেষ হারের মুনাফা রক্ষা করতে হলে তাদের দিয়ে লাভজনকভাবে শোষণকাজ করা চলে না, পুঁজিতন্ত্রে বিশেষ প্রকারের বণ্টন বিধিকে রক্ষা করে পুঁজির শোষণকাজকে সব সময়ের জন্যে অব্যাহত রাখা চলে না।

কখনো এটা ঠিক না যে ধনোৎপাদন খুব বেশি হয়েছে; তবে কখনো কখনো পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনতিরিক্ত ধনোৎপাদন হয়ে পড়ে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার অন্তরায় নিচের দুটো সত্যের ভেতর ফুটে ওঠে :

(১) শ্রমের উৎপাদন শক্তির বিকাশ মুনাফার হারের হ্রাসের ভেতর এমন একটা সূত্র (law) সৃষ্টি করে যে একটা বিশেষ সময়ে এই বিশিষ্ট উৎপাদন প্রথার সাথে তা শত্রুতার সম্বন্ধেই দাঁড়ায়। এই বিরোধিতায় উৎপাদন প্রথার পরাজয় অনিবার্য; এই পরাজয়ের প্রকাশ হয় সংকটের মধ্যে দিয়ে।

(২) উৎপাদনে প্রসারণ অথবা সংকোচন নির্ভর করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, অথবা মোট পুঁজির সাথে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাতের উপর। এই অনুপাতই পুঁজিপতির ভাষায় মুনাফার হার। সমাজের অন্তর্গত মানুষগুলোর চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদন কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। তাই পুঁজিতন্ত্র অগ্রসর হতে হতে এমন সব অন্তরায়ের সামনে দাঁড়ায় যে তার গতি স্তব্ধ না হয়ে পারে না।

শ্রমের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করাই পুঁজির ঐতিহাসিক কাজ ও দায়িত্ব। ঠিক এই পথেই পুঁজিতন্ত্র অজানিত (unconscious) একটি উচ্চতর উৎপাদন প্রথার বুনিয়াদ সৃষ্টি করে। পুঁজির যুগ একটা সীমাবদ্ধ সামাজিক ঘটনা; সুতরাং উৎপাদন প্রথার উন্নয়নের পক্ষে পুঁজি-যুগের বিশিষ্ট অন্তরায়গুলো বিলীন না হয়েই পারবে না।

কারখানাওয়ালা মালিক তার কারখানায় ৩০ হাজার গজ কাপড় উৎপন্ন করা-মাত্র ৩ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং এ মার্চেন্টের কাছে তা বিক্রি করে দিল। এই টাকা হাতে পেয়ে সে কাপড় পুনরুৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি কিনে নিল। মালিক এই মার্চেন্টকে কাছে পায় বলে তার উৎপাদনের কাজ সে অব্যাহতভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। মালিকের দিক থেকে দেখতে গেলে, তার পণ্যকে সে মুদ্রায় পরিণত করতে পেরেছে। অবশ্য কাপড় এখনও তার প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে নি। উৎপাদনের জন্যেই হোক আর ভোগের জন্যই হোক, এখনও কাপড় মার্চেন্টের হাত ছাড়িয়ে এমন লোকের কাছে পৌঁছায় নি যেখানে তা ব্যবহার মূল্য (use value) রূপে কাজে আসবে। যে কাপড় মালিকের হাতে ছিল তাই এখন মার্চেন্টের হাতে থাকল; মার্চেন্টের অভাবে মালিককে যে কাজ করতে হতো মার্চেন্টই এখন তা করবে। মালিকের কাজ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল, কেননা মার্চেন্ট তার কাজের ভার নিয়েছে।

মার্চেন্ট মধ্যস্থর কাজ করে মাত্র, পণ্যোৎপাদন তার কাজ না। জিনিস কিনে আবার বিক্রি করাই তার ব্যবসা, কিন্তু কিনতে গেলেই তার হাতে মুদ্রা থাকতে হবে। মুদ্রারূপ পুঁজির (Money capital) মালিক হতে হবে তাকে। সুতরাং সমাজের সমগ্র পুঁজির একাংশ বাজারে অর্থাৎ সঞ্চারণের (circulation) কাজে নিয়োজিত থাকবে। এই পুঁজিকেই বলা হয় ব্যবসায়ী পুঁজি (merchant capital) উৎপাদনে যে পুঁজি খাটে তা থেকে এই পুঁজি আলাদা। বাজারে এই পুঁজি আছে বলেই মালিককে তার কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বিক্রির জন্যে অনির্দিষ্টকাল বাজারে বসে থাকতে হয় না।

আগেই আমরা দেখেছি যে বাজারে কেনা-বেচার ভেতর কোন মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় না। এখানে শুধু পণ্য এবং মুদ্রার হস্তান্তরই হয়ে থাকে। বিক্রির মাধ্যমে যে উদ্বৃত্ত মূল্য হাতে পাওয়া যায় তার কারণ এই নয় যে নতুন কোনো উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়েছে; উৎপাদিত পণ্যের ভেতর যে উদ্বৃত্ত মূল্য নিহিত রয়েছে তাই মাত্র মুদ্রার রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যবসায়ী পুঁজি উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে না; উদ্বৃত্ত মূল্যকে মাত্র মুদ্রায় রূপান্তরিত করে। সমাজের মোট পুঁজির বিভাগের জন্যে উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন কাজ তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়। অথচ কারখানায় যে পুঁজি খাটে তার তুলনায় ব্যবসায়িক পুঁজির পরিমাণ খুব কম বলা চলে।

দ্রব্যের পুনরুৎপাদনের জন্যে উৎপাদন স্তরের মতো সঞ্চারণের স্তরও একইভাবে প্রয়োজনীয়। সুতরাং কারখানা পুঁজি থেকে স্বতন্ত্রভাবে যে পুঁজি খাটে তার জন্যে একটা গড়পড়তা মুনাফার হার চাই। ব্যবসায়িক পুঁজিতে মুনাফার হার বেশি হলে কারখানা পুঁজির একাংশ সেদিকে আকৃষ্ট হবে; আবার ব্যবসায়িক পুঁজির মুনাফার হার কম হলে এর একাংশ কারখানা পুঁজির দিকে আকৃষ্ট হবে। ব্যবসায়িক পুঁজি নিজে যখন কোন উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে না, তখন কারখানা পুঁজি যে মুনাফা সৃষ্টি করে তারই একাংশ এই পুঁজির মুনাফা হবে। এখন কথা উঠবে, ব্যবসায়িক পুঁজি সমগ্র মুনাফার তার আপন অংশ কিভাবে আত্মসাৎ করবে।

ধরা যাক, এক বছরে মোট কারখানা-পুঁজি দেয়া হয়েছে ৭২০C + ১৮০V = ৯০০; শোষণের হার ১০০%। যে দ্রব্য তেরী হলো তার মোট মূল্য ১০৮০; গোটা দ্রব্যের মোট মূল্য এবং উৎপাদনের বাজার দর যে একই, আগেই আমরা দেখেছি। সমাজে মোট পুঁজির মুনাফার হার একই ক্ষেত্রে ২০%। আমাদের আগের হিসাব অনুযায়ী গড়পড়তা মুনাফার হার দেখা গেল শতকরা কুড়ি। কিন্তু এই ৯০০ ছাড়া আরও ১০০ ব্যবসায়িক পুঁজি হিসাবে খাটে; সুতরাং মোট পুঁজির পরিমাণ ৯০০ + ১০০ = ১০০০। ব্যবসায়িক পুঁজি এই মোট পুঁজির দশমাংশ। এই ক্ষেত্রে উভয় পুঁজির গড়পড়তা মুনাফা হবে ১৮%। কারখানার মালিকেরা মার্চেন্টদের কাছে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করবে ৭০২C + ১৮০V + ১৬২S = ১০৬২। মার্চেন্ট আবার বাজারে পুরো মূল্য অর্থাৎ ৭২০C + ১৮০V + ১৮০S = ১০৮০ তে বিক্রি করবে। মার্চেন্টের পুঁজি গড়পড়তা মুনাফার হার ঠিক করার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাথমিক সঞ্চয়

পুঁজিতন্ত্র প্রবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত মুদ্রার কাজ ছিলো বাজারে দ্রব্য কেনা। কিন্তু যখন থেকে মুদ্রা দিয়ে একটা বিশেষ প্রকারের পণ্য কেনা হতে লাগল তখন থেকেই শুরু হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা। এই বিশেষ প্রকারের পণ্যটা অন্য আর কিছুই না, শ্রমিকের শ্রম-শক্তি। তখন থেকেই মুদ্রা পরিবর্তিত হল পুঁজিতে। পুঁজির একমাত্র ধর্ম তার আপন প্রসার এবং মুনাফা সৃষ্টি। এরূপ উৎপাদন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার আগে কতগুলো লোকের হাতে মুদ্রার সঞ্চয় হয়েছিল, একে বলা হয় ব্যবসায়িক পুঁজি। কেননা ব্যবসা থেকেই তা আহরণ করা হয়েছে। এই সঞ্চয়কে মার্কস আখ্যা দিয়েছেন প্রাথমিক সঞ্চয় (primitive Accumulation)।

বাইবেলে বলা হয়েছে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আদম যে পাপ করেছিল, তা থেকে উদ্ভব হয়েছে মানুষের দুর্গতি। তখন থেকেই মানুষকে জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়েছে শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে। কিন্তু 'বুর্জোয়া ইকনমি' আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, সব মানুষকেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে মেহনত করতে হয় না। অধিকাংশ লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করবে, আর মুষ্টিমেয় কিছু লোক তার ফল ভোগ করবে। 'বুর্জোয়া ইকনমি' নীতি-শিক্ষা দিতেও ছাড়েনি। প্রথম থেকেই যারা অমিতব্যয়ী, সঞ্চয় করতে পারে নি, দুঃখ তাদেরই। সৎভাবে যারা জীবন-যাপন

করেছে, তারাই শুধু এখনও পর্যন্ত বিনা মেহনতে জীবিকা অর্জন করতে পারছে। কিন্তু যথার্থ ইতিহাস কি তা-ই? ইতিহাস বলবে–এরকম অধিকার-বৈষম্যের কারণ যুদ্ধ, হত্যা, দস্যুতা–এক কথায় সব ধরনের জুলুম এবং জবরদস্তি। প্রাথমিক সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল এগুলোরই সহায়তায়।

মুদ্রা, পণ্য, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলো পুঁজিতন্ত্রের আগেও ছিল। কিন্তু তখন তা পুঁজিরূপে ছিল না। পুঁজিতে এগুলোর রূপান্তর এমনি সম্ভব হয়নি। পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল কথাই হলো এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা চাই যেন বহু লোক যন্ত্রপাতির অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়, তবেই তারা নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণের সাহায্যে আপন শ্রমশক্তিকে বাস্তব আকার দেয়ার সুযোগ পাবে না। একবার পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হলে মানুষ ও তার যন্ত্রপাতির বিচ্ছেদ পুঁজিতন্ত্র শুধু সংরক্ষণই করে না, বিচ্ছেদকে বাড়িয়ে তোলাই হয়ে ওঠে তার ধর্ম। অধিক থেকে অধিকতর লোককে তাদের যন্ত্রপাতির অধিকার থেকে বিচ্যুত করে শ্রমিক জীবন যাপন করতে বাধ্য করাই তখন পুঁজির প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। উৎপাদনকারীকে তার যন্ত্রপাতি থেকে বিচ্যুত করাই হয়ে দাঁড়ায় তথা-কথিত প্রাথমিক সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক কাজ।

পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ফিউদ-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ফিউদ্ ব্যবস্থার ভেতরই পুঁজিতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল; প্রথমটার বিনষ্টি থেকেই পরেরটার জন্ম হয়েছে।

উৎপাদনকারী ফিউদ্ বা সামন্ত যুগের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়েই প্রকাশ্য বাজারে তার শ্রমশক্তি বিক্রি করার অধিকার অর্জন করে। বুর্জোয়া এটুকুই বুঝতে পারে যে উৎপাদনকারীকে মজুরে পরিবর্তিত করতে হলে আগেকার গিল্ড প্রভৃতি উৎপাদন প্রথার বিলোপ আবশ্যক। কিন্তু সে স্বীকার করতে রাজী না বা দেখেও দেখতে চায় না যে উৎপাদনকারীকে মজুরে পরিণত করার সাথে সাথেই উৎপাদনের উপকরণের অধিকার তার হাত থেকে খসে পড়ছে। ফিউদ্ তন্ত্র থেকে উৎপাদনকারী মুক্তিলাভ করল বটে; কিন্তু ফিউদ্‌তন্ত্র তাকে যেমন জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে পারত, পুঁজিতন্ত্র তা পারল না। পুঁজিপতি কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ আপন অধিকারে আনার কাহিনী মানবজাতির ইতিহাসে রক্তের ও আগুনের অক্ষরে লেখা রয়েছে।

গিল্ডের উচ্ছেদই শুধু না, অভিজাতবর্গের বিনাশও পুঁজিপতির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। কেননা এই শ্রেণীর হাতেই তখনো সব বিত্তের অধিকার। মালিক সমাজের অধিকাংশ লোককে স্বাধীনভাবে যদৃচ্ছ শোষণ করবে–অভিজাত বর্গের অস্তিত্ব ছিল পুঁজিপতির এমন লক্ষ্যের পথে শ্রেষ্ঠ অন্তরায়। যেমনই হোক, মজুরের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রকমের দাসত্বও তার বেড়ে গেল। এই দাসত্ব সামন্ততন্ত্রী দাসত্ব থেকে পুঁজিতন্ত্রী দাসত্বে রূপ পরিবর্তন মাত্র। এই ব্যাপারটার মূল্য সত্য হলো পুঁজিতন্ত্র কর্তৃক কৃষককে জমি থেকে ছিনিয়ে নিতে পারার সাফল্য।

চৌদ্দ শতকের শেষাংশে ইংল্যাণ্ডে দাসত্ব প্রথা প্রায় উঠেই গিয়েছিল। তখন জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল কৃষক। তারা জমিদারদের অধীনে নিজ নিজ জমি চাষ

করত। কৃষি মজুরের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অনেক সময় অনেক কৃষকই অবশ্য কৃষি মজুরের কাজ করত। কৃষি-মজুরও কখনো পুরোপুরি জমিচ্যুত হয়নি, তাদের বসতবাড়ির সাথে অন্ততঃ চার পাঁচ একর জমি সংযুক্ত থাকতই। তাছাড়া অন্যান্য কৃষকের মতোই গোচারণ ভূমি এবং গ্রাম-স্থানীয় অধিকার তারা ভোগ করত।

মধ্যযুগে উৎপাদন প্রথা ইউরোপের সব দেশেই প্রায় একই রকম ছিল। রাজার নীচে ছিল কিছু অভিজাত। সর্বনিম্নে কৃষক। জমির বিভাগও করা হতো এই স্তর অনুসারে। কৃষকদের ভিতর জমি ভাগ করে দেয়া হতো বটে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডগুলোর ভিতর মাঝে মাঝে দেখা যেত বৃহদায়তন ভূমিখণ্ড। এগুলো জমিদারেরা নিজেদের অধিকারেই রাখত। কৃষকরা সপ্তায় কয়েক দিন করে জমিদারের জমিতে বেগার দিত।

পনের শতকের শেষার্ধে উৎপাদন প্রথায় পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রথম সূচনা দেখা দিল। রাজা এবং ফিউদ্ অভিজাতবর্গের পরস্পর যুদ্ধের ফলে নতুন এক শ্রেণীর অভিজাতের জন্ম হলো। এই নতুন অভিজাতদের ধারণা হলো, অর্থই একমাত্র শ্রেষ্ঠ শক্তি; যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করা চাই। চাষের জমিকে মেষ চারণের ভূমিতে পরিণত করাই হয়ে দাঁড়াল তাদের একমাত্র চেষ্টা। পশমের তখন খুব চাহিদা। এই নতুন অভিজাতবর্গ তাই বেআইনীভাবে এবং জবরদস্তি করে এজমালী জমি ও ব্যক্তিগত ভূমি দখল করতে শুরু করে দিল এবং তা ঘিরে ফেলতে লাগল।

এই সময়ে আরো একটা ঘটনা আত্মপ্রকাশ করল। রিফর্মেশনের সময়ে ক্যাথলিক চার্চ ছিল ইংল্যাণ্ডের বহু জমির মালিক। ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিধ্বস্ত করে জমি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মযাজক সম্প্রদায় নিঃস্বত্ব হয়ে পড়ল। জমিগুলো খুব কমদামে বিক্রি করা হলো রাজার অনুগতদের কাছে। তারা কৃষকদের স্বত্ব অস্বীকার করে তাদের জমি থেকে উৎখাত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। এভাবে অনেক মানুষ জমিচ্যুত হলে রাণী এলিজাবেথের সময়ে Poor Rate আইন করে এদের 'পপ্যার' (Pauper) বলে ঘোষণা করা হলো। উইলিয়াম কবেট তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন—সব আইনের গোড়াতেই একটা করে ভূমিকা (Preamble) সন্নিবিষ্ট করা হয়, কিন্তু Poor Rate আইনে কোন ভূমিকা নেই। বিষয়টা এতই লজ্জাকর এবং বর্বোরোচিত ছিল যে ব্যবস্থাপকরা তা বাদই রেখে গেছেন।

কৃষকদের চেয়ে একটু উচ্চস্তরে ছিলো ফার্মার সম্প্রদায়। সতের শতকের শেষ দশকেও দেখা গেছে, কৃষকের সংখ্যা ছিল ফার্মারের সংখ্যা থেকে বেশি। কৃষকদের নাম ছিল ইয়ম্যান। তারা নিজেদের জমিতে নিজেরা খাটত, ফার্মাররা জমিদারদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে কৃষি মজুর সহযোগে ফসল উৎপাদন করত। এদের আমরা বলব পুঁজিপতি। ১৭৫০ এর ভিতরে স্বাধীন উৎপাদনকারী কৃষকশ্রেণী একেবারেই নির্মুল হয়ে গেল। সাথে সাথে বিলুপ্ত হলো সর্বসাধারণের অধিকারভুক্ত জমি।

স্টুয়ার্টদের সিংহাসনে পুনঃঅধিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে আইনের সাহায্যেই এই জমি আত্মসাৎ শুরু হলো। ১৬৮৮-র বিপ্লব শুধু উইলিয়াম অব অরেঞ্জকেই বিদেশ থেকে আমদানী করেনি, সাথে সাথে পুঁজিপতির দলকেও সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রের

অধীনে যে সব জমি ছিল, সেগুলো প্রায় বিনামূল্যেই বিক্রি হতে লাগল। তাছাড়া অনেক ভূস্বামী রাষ্ট্রের কোন অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই নিজের জমির সাথে রাষ্ট্রের নাম জুড়ে দিল। এভাবে রাষ্ট্রের এবং চার্চের জমিগুলো অধিকার করে নতুন ভূস্বামীরা আপন সম্প্রদায় গড়ে তুলল। বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা এই ব্যবস্থাকে সমর্থন না করে পারে না, কেননা এ থেকে মজুরের সংখ্যাও বাড়বে, আবার পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে চাষ করিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য উপার্জনও সম্ভব হবে।

পনের ও ষোল শতকে কি করে সম্পূর্ণ জুলুমের সাহায্যে জমি কৃষকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তা আমরা দেখেছি। আঠার শতকে কিন্তু আগের মতো জমি আত্মাসাৎ করে নেয়া বেআইনি থাকল না। পার্লামেন্ট আইন করে এই ব্যাপারটাকে সমর্থন করতে লাগল। 'জমি ঘেরাও করে নেয়া'—মূলক (enclosure) পার্লামেন্টের আইনগুলোর দিকে তাকালেই তা আমরা বুঝতে পারি। এই আইনগুলোর বলেই ভূস্বামীরা সাধারণ সম্পত্তিগুলো নিজেদের ভেতর ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে পেরেছে।

আঠার শতকে তেমন বুঝতে পারা যায় নি, উনিশ শতকেই ভাল করে বোঝা গেছে—সামাজিক বিত্তের বৃদ্ধি দারিদ্রেরই নামান্তর। এই সময়ে সমাজের সর্বনিম্নতম লোকেরা ক্রমেই গরীব হতে লাগল; জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনিব থেকে তারা দিন মজুরে পরিণত হতে লাগল। জীবনযাত্রার জন্যে যা ন্যূনতম, উপার্জন যখন তারও নীচে নেমে আসল, তখনই মজুরির পরিপূরক হয়ে আসল পুওর রেট (Poor Rate)।

চার্চ ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি আত্মসাৎ, সাধারণ সম্পত্তির উপর জোর করে অধিকার বিস্তার, ফিউদ্ যুগের কৃষকদের সম্পত্তি থেকে অপসারণ—এগুলোই হলো প্রাথমিক সঞ্চয়ের নৃশংস কাহিনী। এসব কারণে পুঁজিতান্ত্রিক প্রথায় জমি চাষের একদিকে যেমন সুবিধা হয়ে গেল, তেমনি কৃষককে মজুরে পরিণত করে শহরে কারখানায় খাটানোরও সুযোগ দেখা দিল।

ধীরে ধীরে মজুরের সংখ্যা এতই বেড়ে গেল যে, উৎপাদন কখনো তাদের সবার কাজ যোগাতে পারল না। তাছাড়া এই অভাগা মানুষগুলো সহসা তাদের গতানুগতিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় নতুন অবস্থায় একদিনেই খাপ খাইয়ে চলতে পারল না। কাজে কাজেই এদের অনেককেই হতে হলো ভিক্ষুক, চোর, দস্যু। এসব বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করে তাদের শাস্তি দেয়ারও ব্যবস্থা করা হলো। একমাত্র বৃদ্ধ ও বয়স্ক ভিক্ষুকদের লাইসেন্স দেয়ার ব্যবস্থা হল, প্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে ভিক্ষা করতে দেখলে শাস্তিস্বরূপ তাদের জেল, বেত্রাঘাত এসব প্রদত্ত হতো। কোন ভিক্ষুককে কাজ করতে বললে সে যদি অস্বীকৃত হয় তবে তাকে দাসরূপে গণ্য করা হতো। তার গালে অথবা পিঠে লিখে দেয়া হতো 'S' (slave)।

এভাবে, একদিকে কৃষিজীবী লোকগুলোকে জমির অধিকার ও চাষ থেকে বহিষ্কৃত করে ভিক্ষুক, চোর, দস্যু-এসবে পরিণত করা হলো, অন্যদিকে তাদের শায়েস্তা করার জন্যে বিভিন্ন দমনমূলক আইনেরও ব্যবস্থা করা হলো।

আমরা জানি, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন যতো বেশি সামনে অগ্রসর হয়, ততই উত্তরোত্তর অধিক লোক জমিচ্যুত হয়ে শ্রমিক জীবন গ্রহণ করতে এবং বেকার হতে বাধ্য হয়। মোট জনসংখ্যার একটা অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সংখ্যা সব সময়ই কর্মহীন অবস্থায় থাকে। শ্রমিকের জন্যে বাজারে যে চাহিদা, তা থেকে তাদের সংখ্যা বেশি, ফলে পুঁজিপতির পক্ষে তার মজুরি যথাসম্ভব কমিয়ে দেয়ার সুযোগ ঘটে। পুঁজিতন্ত্রের প্রথম যুগেই এই সুবিধা পুঁজিপতি গ্রহণ করতে পারে নি। তাই শ্রমিক যেন বেশি মজুরি দাবী করতে না পারে, সেই ব্যবস্থার জন্যে মালিকরা রাষ্ট্রকে দিয়ে আইন করিয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, এলিজাবেথের সময়ের একটা আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। যদি কোন মালিক বেশি মজুরি দেয় তবে তার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হলো দশদিনের কয়েদ, আর যে বেশি মজুরি নেবে তার জন্যে আইন হলো একুশ দিনের কয়েদ। এমন আরো কতগুলো আইন হল যার জোরে পুঁজিপতি শ্রমিককে নির্দিষ্ট মজুরিতে বেশি সময় খাটাতে গিয়ে প্রয়োজনমত কায়িক শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে। চৌদ্দ শতক থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া বেআইনী ও নিষিদ্ধ ছিল।

ইংল্যাণ্ডের কথা ছেড়ে ফ্রান্সের কথাই ধরা যাক। ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু কেবল ক্ষমতা হাতে পাওয়া বুর্জোয়ারা ১৭৯১ সালের ১৫ জুন একটা আইন প্রণয়ন করে ঘোষণা করল, শ্রমিক সংঘ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী, তাই কেউ যদি সংঘ করে বা সংঘে যোগদান করে তার জন্যে শাস্তির বিধান হলো পাঁচশ লিভার জরিমানা। শুধু তাই না, এক বছর তার কোনো নাগরিক অধিকার থাকবে না।

কৃষি মজুরের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে তা আমরা দেখেছি। 'ফার্মার শ্রেণী' কিভাবে গড়ে উঠেছে তাই এখন বিবেচ্য। ইংল্যাণ্ডে 'বেইলিফ' নামে একটা সম্প্রদায় ছিল– তারা সার্ফ বা আধা দাস। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি তাদের জায়গায় দেখা দিল 'ফার্মার'। ভূস্বামীরা এদের বীজ, যন্ত্রপাতি ও পশু সরবরাহ করে। কৃষক থেকে তাদের খুব বেশি পার্থক্য নেই। পার্থক্য এটুকু যে, ফার্মার জমিতে মজুর নিয়োগ করে থাকে। তারপর সে হয়ে দাঁড়ায় 'মেটায়ার' আধাআধি ফার্মার। কৃষির জন্যে যে সব উপকরণ প্রয়োজন তার একাংশ এখন থেকে সে নিজেই দেয়, অন্য অংশ ভূম্যধিকারী জমিদারের। ধীরে ধীরে উৎপাদনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবটুকু অংশ সে নিজেই দিতে শুরু করে। মজুর নিয়োগ যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে, তার একটা অংশ হয় তার মুনাফা, অন্য অংশটা ভূম্যধিকারীর 'রেন্ট' বা খাজনা। এভাবে প্রকৃত পুঁজিবাদী ফার্মারের উদ্ভব হলো।

কৃষকশ্রেণীর উচ্ছেদ থেকে যেমন 'ফার্মার' এর সৃষ্টি হলো, তেমনি পুঁজিপতির পণ্য-সামগ্রী বিক্রির জন্যে একটা দেশীয় বাজার দেখা দিল। আগে কৃষক ও তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা নিজেদের জমিতে ফসল উৎপাদন করত, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও আপন পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই তৈরি হতো। পুঁজিবাদের উদ্ভবের সাথে সাথে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এই ঐক্যটা একদমই ভেঙ্গে যায়। এর

আবির্ভাবে কৃষকদের আত্মনির্ভর জীবনের আর কোন চিহ্ন থাকল না। খাদ্যসামগ্রী এখন আর কৃষক নিজে উৎপাদন করে না। এখন থেকে পুঁজিপতির হাতে যে পুঁজি রয়েছে, কৃষকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তারই অঙ্গীভূত হয়ে গেল। অর্থাৎ তাকে এখন মজুরি অর্জন করে পুঁজিপতির কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য-সামগ্রী কিনতে হবে। এভাবে একটা খরিদ্দারশ্রেণী সৃষ্টি হয়ে স্বদেশেই পুঁজিপতির পণ্যাদির বাজার দেখা দিল।

বর্তমান যুগ মধ্যযুগ থেকে দুই ধরনের পুাজির উত্তরাধিকার লাভ করেছে। একটা কুশীদজাত পুঁজি, অন্যটা ব্যবসায়িক পুঁজি। সুদ খেয়ে যে পুঁজি জমানো হয়েছে তাই প্রথমটা, আর ব্যবসা থেকে যা জন্মেছে, দ্বিতীয়টা তাই। একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছেন, কুশীদের বিরুদ্ধে এত প্রকার আইন করা হলো তবুও পুঁজি এতো জেঁকে বসল কি করে? কোন আইনের বলে পুঁজি এখনকার এই বিত্তের অধিকারে এত পরিবর্তন ঘটাতে পারল? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন কখনো আইনের বলে সম্ভব হয় না।

একটা সময় দেখা গেল, কুশীদ ও ব্যবসা থেকে যে সঞ্চয় হচ্ছে, কারখানা পুাজিতে তার পরিবর্তিত হওয়ার পথে সাক্ষাত সামন্ত সমাজব্যবস্থা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামন্ততন্ত্রের অপসারণ হলে তবে এই শৃঙ্খল দূর হলো।

আমেরিকায় সোনা ও রূপা আবিষ্কার, আদিম অধিবাসীদের উপর সব ধরনের পীড়ন নির্যাতন, ইস্ট ইণ্ডিজ জয় ও লুট, আফ্রিকার কালো মানুষ শিকার ও সংগ্রহ— এগুলোই হলো পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের গোড়ার দিকের ইতিহাস। প্রাথমিক সঞ্চয়ের এগুলোই মূল। এগুলোরই পশ্চাতে এসেছে ইউরোপের জাতিগুলোর সারা পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যযুদ্ধ।

সতের শতকে ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক সঞ্চয়ের যতোগুলো উপায় আছে, তার সবগুলো একসাথে দেখা দেয়। উপনিবেশ অধিকার, জাতীয় ঋণ-সংগ্রহ, নবোদ্ভাসিত ট্যাক্স পদ্ধতি, শুল্কনীতিতে সংরক্ষণপন্থা– এসবের কোনোটাই বাদ পড়ল না। এগুলোর পিছনে রয়েছে পশুবল বা রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ। এসবের সহযোগে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে সদ্য অঙ্কুরিত নতুন সমাজকে টেনে বের করতে হলে বল প্রয়োগই (Force) করবে ধাত্রীর কাজ।

খৃস্টধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হাউয়িট একটা উল্লেখযোগ্য উক্তি করেছেন : জগতের সর্বত্র এবং সব জাতির উপর খৃস্টধর্মীয় জাতিগুলো যে পরিমাণ নৃশংস ও বর্বোরোচিত আচরণ করেছে ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সতের শতকে হল্যান্ড ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলোর শীর্ষস্থানীয়। সে যুগে ওলন্দাজদের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, নীচতা ও বর্বরতার ইতিহাস ছাড়া আর কিছু না। জাভার ওলন্দাজ পুঁজিপতিদের অধীনে দাস জীবন যাপন করার জন্যে ছেলে চুরি হয়ে দাঁড়াল ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মস্ত অঙ্গ এবং বিশেষত্ব। একটা সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, এক মেকেসার শহরেই এই চুরি করা ছেলেগুলোকে হাত-পা শৃঙ্খলিত অবস্থায় বন্দী ও লুকিয়ে রাখার জন্যে যে কতো হাজার কয়েদখানা আছে তার ইয়ত্তা নেই।

ইংলন্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে একদিকে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে, অন্যদিকে প্রাচ্যের বহু স্থানে, বিশেষতঃ চীনে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার অর্জন করে। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও উপকূল-বাণিজ্য হয়ে দাঁড়াল কোম্পানীর উচ্চপদস্থ চাকুরেদের একচেটিয়া। লবণ, পান, আফিম প্রভৃতির একচেটিয়া স্বত্ব অর্থাগমের এক অফুরন্ত উৎস। এই চাকুরি, ব্যবসায়ীরা নিজেরাই জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট করে দিত। স্বয়ং বড়লাটদের পর্যন্ত এসব কাজে হাত থাকত। এক শিলিংও খাটাবার প্রয়োজন হয়নি, অথচ পুঁজির সঞ্চয় শুধু বেড়েই চলেছে। পার্লামেন্টে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। হেস্টিংস সলিভ্যান নামে একজন ইংরেজ কর্মচারীকে আফিমের চুক্তি দেয়। সলিভ্যান বিন্ নামে আর একজনের কাছে এই চুক্তি বিক্রি করে। সে আবার ষাট হাজার পাউন্ডে তা অন্য একজনকে দেয়। এভাবে একজন অন্যজনকে চুক্তিটা ছেড়ে দিয়ে মুনাফা রাখত। পার্লামেন্টে একটা তালিকা পেশ করা হয়েছিল, তা থেকে দেখা গেল, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬-র ভিতর কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা ভারতীয়দের কাছ থেকে একমাত্র বখশীষ্ হিসেবেই পেয়েছে ষাট লক্ষ পাউন্ড। ১৭৬৯-৭০-এ ইংরেজ বণিকরা সমস্ত উৎপাদিত ধান কিনে এবং আটকে রেখে ভারতবর্ষে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। অনেক বেশি দাম না নিয়ে তারা ধান ছাড়তে রাজী হয় না।

ঔপনিবেশিক লুঠ-তরাজ ছাড়াও প্রাথমিক সঞ্চয়ের একটা চমৎকার উপায় আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় ঋণ অথবা গভর্নমেন্টকে ঋণদানের ব্যবস্থা থেকে পুঁজিপতির হাতে মোটা রকমের সুদ জমতে শুরু করল। জাতীয় ঋণ থেকেই উদ্ভব হলো ব্যাংকের। যারা সরকারকে ঋণ দেয় তাদের হাতে থাকে 'কোম্পানীর কাগজ'। যে কোন সময় বাজারে উঁচু দামে এগুলো বিকোয়। এ থেকে স্টক এক্সচেঞ্জের উৎপত্তি। এই 'জাতীয় ঋণ' বাবদ বছর বছর যে সুদ দিতে হয়, তা যোগাতে যেয়ে সাধারণ লোকের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর সরকার কর ধার্য করে। তাছাড়া আর একটা বিষয় রয়েছে শুল্কনীতিতে সংরক্ষণপন্থা। বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করে এমন ব্যবস্থা করা হয়, যেন সেগুলো স্বদেশের বাজারে ঢুকতে না পারে। এই ব্যবস্থায় দেশীয় পুঁজিপতিদের দ্রব্য-সামগ্রী সাধারণ লোকের কাছে বেশি দামে বিক্রি করার সুবিধা হয়।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, জাতীয় ঋণ, উচ্চহারে কর, সংরক্ষণ শুল্ক, বাণিজ্য বিষয়ে যুদ্ধ– একগুলো যন্ত্রশিল্প শুরু হবার আগের বিশেষত্ব হলেও, পরেও এগুলো তীব্র রূপ নেয়।

এখন আমাদের দেখতে হবে প্রাথমিক সঞ্চয় কোথায় গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তিগত বিত্তের চেহারা বদলেছে। ক্ষুদ্র উৎপাদনে যে-ই শ্রমকারী, যন্ত্রপাতির অধিকারও তারই। ক্ষুদ্র উৎপাদনে জমি খন্ড খণ্ড ভাবে বহু লোকের অধিকারে থাকে, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণও ছড়িয়ে থাকে। এদের কেন্দ্রীভূত করে সমবায়-প্রথার উৎপাদন পরিচালনা তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু এমন কতগুলো সামাজিক ঘটনার সৃষ্টি হলো যে ক্ষুদ্র উৎপাদনের বিলোপ

অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। সমাজে তখন নতুন নতুন শক্তি, নতুন নতুন প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পুরনো সমাজ ব্যবস্থা এগুলোকে শৃঙ্খলিত করে রাখবে, এদের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এই পুরনো সমাজকে বিলুপ্ত করে ব্যক্তিগত উৎপাদনের জায়গায় সমষ্টিগত উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন জমি থেকে কৃষকের উচ্ছেদ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ থেকে প্রকৃত শ্রমকারীর অধিকার হরণ, মুষ্টিমেয়র হাতে জমি ও যন্ত্রপাতি কেন্দ্রীভূত।

এগুলো হলো পুঁজির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সূচনা। এই পরিবর্তনের ধারা যখন পুরনো সমাজকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করল, শ্রমকারী জমিজমা ও যন্ত্রপাতিহীন দিনমজুরে পরিণত হলো, তখন উৎপাদন নতুন একটা রূপ পরিগ্রহ করল। ব্যক্তিগত বিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিতই থাকল বটে, কিন্তু অনেক মানুষ ব্যক্তিগত-বিত্ত থেকে বিচ্যুত হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ল। পুঁজিবাদের মারণ-অস্ত্র রয়েছে পুঁজিবাদের বিকাশের ভিতরে। একজন পুঁজিপতি বড় হতে পারে প্রতিযোগিতার যুদ্ধে অন্য একজন পুঁজিপতিকে ধ্বংস করে। এইভাবে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণগুলো মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। শ্রম-প্রক্রিয়া সমবায় রীতিতে পরিচালিত হয়, উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্তিত হয়। প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজিপতি মালিকের সংখ্যা কমে যতোই বড় বড় জনকয়েক পুঁজিপতি দেখা দেবে, ততই দারিদ্র্য, পীড়ন, দাসত্ব ও শোষণ বেড়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের দল বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে। বড় বড় কারখানায় তারা যতো বেশি সংখ্যায় সমবেত ও একত্রিত হয়, ততই তারা সংঘবদ্ধ ও শৃংখলাবদ্ধ হতে থাকে। শ্রমের এই সমষ্টিগত এবং উৎপাদনের সমাজগত রূপ এতো প্রচণ্ডভাবে বিকশিত হয় যে উৎপাদনের বিকাশের পথে পুঁজিতন্ত্র স্বয়ংই হয়ে দাঁড়ায় মস্ত প্রতিবন্ধক। যে কাঠামোর ভেতর নতুন উৎপাদন শক্তি উদ্গত হয়েছে তার প্রচণ্ড বেগ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে পুঁজিতন্ত্র স্বয়ংই ধ্বসে পড়ে। এতকাল যারা শোষণকারী ছিল, তাদেরই আজ নিঃস্বত্ব হতে হবে।

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র উৎপাদন ধ্বংস করে পুঁজিবাদী উৎপাদন গড়ে উঠেছে। এরূপ উৎপাদনে বহু লোকের শ্রম সমবেতভাবে নিয়োজিত হলেও উৎপাদনের ফল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু এই উৎপাদনের ভিতরেই তার ধ্বংসের বীজ সৃষ্টি হয়েছে। এই ধ্বংসের মাধ্যমে শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি হবে না, সমাজ-সম্পত্তির উপর তাদের সমবায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ঘটবে। পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাবের সময় মুষ্টিমেয় লোক বহু লোকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে; পুঁজিতন্ত্রের অবসানের সময় আমরা দেখছি বহুসংখ্যক লোক অল্পসংখ্যক লোকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে।

একরকমের ব্যক্তিগত-বিত্ত নির্ভর করে উৎপাদনকারীর আপন শ্রমের উপর, অন্যরকমের ব্যক্তিগত-বিত্ত নির্ভর করে অন্যকে খাটানোর উপর। পলিটিক্যাল ইকনমি দুয়ের পার্থক্য বুঝতে না পেরে গোল বাঁধিয়ে ফেলে। তারা বুঝতে পারে না

যে পরেরটা প্রথমটার অস্তিত্ব লোপ করে গড়ে উঠতে পারে। পরেরটাকে আমরা বলি পুঁজিতন্ত্র; এই পুঁজিতন্ত্র যখন সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছে, তখন আর তার উদ্ভবের কারণগুলো না দেখে পলিটিক্যাল ইকনমি জোর গলায় বলতে ছাড়ে না যে পুঁজি এবং পুঁজি-সংক্রান্ত সূত্রগুলো চিরকালই আছে, এগুলো কোন যুগ বিশেষের সৃষ্টি না। কিন্তু উপনিবেশগুলোতে তা নয়; সেখানে আপন যন্ত্রপাতি এবং উপকরণাদির মালিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা পুঁজিপতিদের চেষ্টা ও স্বার্থের সাথে সংঘর্ষে আসে। যেখানে পুঁজিপতিদের পশ্চাতে তাদের নিজেদের রাষ্ট্রশক্তি তাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে, সেখানে জোর করেই উপনিবেশগুলোর পুরনো উৎপাদন-প্রথার উৎখাত করে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। পলিটিক্যাল ইকনমিস্টরা সাধারণত পুঁজিপতিদের তোষামুদে ও ভাড়াটে। ইংলন্ডের মতো পুরনো দেশে পুঁজিপতির স্বার্থকে সমর্থন করতে হলে বলতেই হয় যে পুঁজি একটা সনাতন বস্তু; আবার উপনিবেশগুলোর মতো নতুন দেশে পুঁজিপতির স্বার্থ-রক্ষার জন্যে ইকনমিস্টদের স্বীকার করতে হয়, পুরনো উৎপাদন-প্রথাকে উৎখাত করে তবে পুঁজির প্রতিষ্ঠা হবে। এই বিরোধকে স্বীকার না করে তো উপায় নেই, কেননা, মজুর সৃষ্টি না করে যে বিদেশি পুঁজিপতির স্বস্তি নেই। ওয়েকফিল্ডের ঔপনিবেশিক তত্ত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য; স্বদেশী গভর্নমেন্টের সাহায্যে পুরনো উৎপাদন-প্রথাকে উচ্ছেদ করে মজুরদের সৃষ্টি করাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন Systematic colonisation।

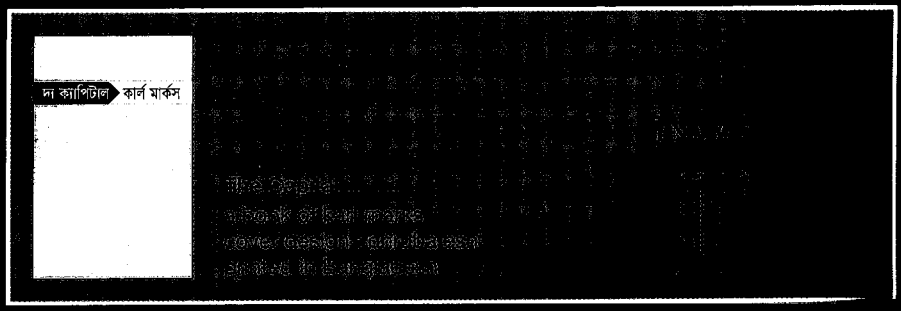
ওয়েকফিল্ড আবিষ্কার করলেন, উপনিবেশিগুলোতে অর্থ, যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য অনেক কিছুর মালিক হলেও তাকে পুঁজিপতি বলা চলে না, যতক্ষণ না তার অধীনে উপযুক্ত পরিমাণ মজুর থাকে। তিনি একটা দৃষ্টান্ত দেখালেন, মিঃ পল ইংলন্ড থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের মুদ্রা ও অন্যান্য উপকরণসহ ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া যান, সাথে তিন হাজার মজুর নিতেও ভুললেন না। সেখানে পৌঁছান মাত্রই এমন একটা লোক আর তার সাথে থাকল না যাকে দিয়ে মিঃ পল তার প্রতিদিনের কাজকর্ম করিয়ে নিতে পারেন।

উৎপাদনের উপকরণসমূহ যতক্ষণ প্রকৃত উৎপাদনকারীর অধিকারে আছে, ততক্ষণ তারা পুঁজি না। এগুলো পুঁজি হতে পারে তখনই যখন এগুলোকে শোষণের কাজে লাগানো সম্ভব হয়, এগুলোকে দিয়ে মজুরদের উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়।

আমরা আগেই দেখেছি, কৃষকদের জমি থেকে ছিনিয়ে নিতে পারলেই পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু উপনিবেশগুলোতে প্রায় সব জমিই রাষ্ট্রের জমি। সেখানে যে কোন ঔপনিবেশিক কম দামে বা নামমাত্র দামে আপন ব্যবহারের জন্যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে জমি কিনে নিতে পারে। স্বদেশ থেকে উপনিবেশে মজুর নিয়ে গেলেও অল্পদিন পুঁজিপতির কাছে কাজ করেই তারা জমি কিনে মালিক হয়ে বসে। ওয়েকফিল্ড তাই বিধান দিলেন, ইংলন্ডের মতো পুরনো দেশগুলোতে মজুরেরা প্রকৃতির নিয়মে পুঁজিপতির দাস হয়ে থাকে, উপনিবেশগুলোর মতো নতুন দেশে এই অবস্থাটা মানুষের ব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্টি করবে।

ইউরোপ থেকে আগত পুঁজিপতির অধীনস্থ শ্রমিকরা কিছুদিন কাজ করে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করলেই সস্তায় জমি কিনে নিজেই মালিক হয়ে বসে—এটা পুঁজিতন্ত্র বিরোধী। এই ক্যান্সারকে দূর করতে না পারলে উপনিবেশে পুঁজিতন্ত্রের ভবিষ্যত একেবারেই অন্ধকার। নিম্নোক্ত ব্যবস্থায় সব অসুবিধা দূর হলো। সরকারি জমি কিনতে হলে তখন আর সস্তায় কেনা সম্ভব না, সরকার থেকে জমির দাম বাড়িয়ে দেয়া হলো। যদি কেউ কিনতে ইচ্ছে করে তাকে বহুদিন পুঁজিপতির অধীনে কাজ করে তবে জমি কেনার মতো পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করতে হবে। জমির দাম বাজারে চাহিদা ও যোগানের নিয়মে নির্ধারিত হবে না, দাম ঠিক হবে পুঁজিপতির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে। এই ব্যবস্থা থেকে আরও একটা সুবিধা হবে। নির্ধারিত জমির উচ্চমূল্য থেকে যে অর্থ সরকারের হাতে জমবে তা ইউরোপ থেকে পুনরায় মজুর আমদানীর জন্যে ব্যয় করা হবে। এই ব্যবস্থা থেকে আমরা উপসংহার করতে পারি, যে মজুর জমির মালিক হতে চলেছে তাকে মালিক হওয়ার আগে পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি সরকারের তহবিলে পুনরায় শ্রমিক আমদানী করার মতো অর্থ জমা দিতে হবে; এই ব্যবস্থা না করে কেউ জমির মালিক হতে পারবে না।

.....


দ্য ক্যাপিটাল
কার্ল মার্কস